নূতনসন্ন্যাস



শ্রীকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ



—:০:—

নকীপুর সিদ্ধান্ত-পুস্তকালয়
হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৯সাল

মূল্য ।।০ টাকা মাত্র

নকীপুর সিদ্ধান্তপ্রেসে
শ্রীবটকৃষ্ণ রায় চৌধুরী দ্বারা
মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপনং

শাস্কারবৃত্তা, নব্য স্মৃতিতা, প্রাচীন বা ল ক্ষত,

নানাপ্রাক্তিমবস্বিতাংশবিগতা জ্ঞাপনেন ন.বা। ১।

কালাকালবিচারবাবিবৃতিচিন্তনানেন মুখ্য

জ্ঞাপকেন বহিক্ তাহা বনিতে বোপকবা পুস্তক।।

যে সন্তঃ স্বতএব কাতরজনান্ গৃহ্নান্ত সান্ত্বয়ন্ত

যে চান্যে 'চবদুর্গতানশরণান্ রক্ষন্তি কারুণ্যতঃ।

আর্য্যাসজ্জনমাত্রমাপদি ভবিষ্যাজ্ঞাস্থলাবেহর কে

শিক্ষাদানরতাতিবিজ্ঞজনতাস্থং হি যে ধারণা।

বিনীত—

শ্রীকেশবচন্দ্র শর্ম্মণঃ

কোটালিপাড়নিবাসিনঃ

এই গ্রন্থখানি

আমার

শ্রী .... কে

উপহার

প্রদান করিলাম।

তারিখ ....

শ্রী ....

নূতনসন্ন্যাস

—ঃ৺ঃ—

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার এই ঘটনাপূর্ণ জীবনে বৈরাগ্যের কি সন্ন্যাসের শুষ্ক রসটা কোথাও কোন দিন পাইলাম না! শ্মশানে নাকি লোকের বৈরাগ্যো-দয় হয়? হইলে, সেটা সরস তো নয়ই,— নিতান্ত শুষ্ক হইবারই কথা! কিন্তু আমার অদৃষ্ট এমনি প্রতিকূল যে, সমস্ত সংসারটা শ্মশানে পরিণত করিয়াও, সেই একটু শুষ্ক বৈরাগ্যরস হইতে আমি চিরবঞ্চিত হইয়া আছি!

আর সন্ন্যাস! — আসমুদ্রহিমাচল ভ্রমণ করিয়া এবং উপন্যাস, নবন্যাস, বেশবিন্যাস, কেশবিন্যাস প্রভৃতি বহুতর ন্যাসের শ্রাদ্ধ করিয়াও বিধিবিড়ম্বনায় প্রকৃত সন্ন্যাসটার কিছুই বুঝিলাম না;— না তার রূপ, না তার রস, না তার গন্ধ, না তার স্পর্শ! তথাপি লোকে বলে, এবং আমিও পরিচয় দেই "আমি বৈরাগী,— আমি সন্ন্যাসী!"

কথাটা যে একেবারে মিথ্যা, তাহাও নয়! বেশভূষা, গতিবিধি, এমন কি কথাবার্ত্তায়ও আমি হয় যথাকথিত বৈরাগী, না হয় সন্ন্যাসীই! এবং বৈরাগ্য কি সন্ন্যাসের খাটি শুষ্ক রসটা না পাইলেও, উহার তরুণ রসের রসিক হইয়াই যে আমি ঐ আখ্যাটা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই!

যদি বলিতেই গেলাম, তবে আর সঙ্কোচ কেন? আমার এই অকবি-সুলভ-ভাষায়ই সব খুলিয়া বলি। তাহাতে কেহ বিরক্ত কি অধীর হইলে চলিবে না,—সকলেরই মন দিয়া শুনিতে হইবে। আর যদি আপনাদের মধ্যে আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমার এই আত্মকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিবেন যে, জীবনে এমন একটা দিন আসিয়া থাকে, যখন সংখের প্রাণটী যেন 'আলালের ঘরের নূতন দুলাল' সাজিয়া বসেন এবং এক নবীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া মনে করেন 'সংসারের যত কিছু সুখ শান্তি আছে, তাহার সকলের উপরই তিনি একাধিপত্য সংস্থাপন করিবেন।' তখন গুরুজন পাঁচ জনেরা যদি নিরাপত্তিতে তাঁহার ভাবানুসরণ করেন, তাহা হইলে তিনি আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া, আপন তালে আপনি নাচিতে থাকেন, আর যদি তাঁহার সেই অবস্থায়, বুদ্ধির বিপাকে, গুরুজন কেহ প্রতিকূল হইয়া তাঁহার 'উপর' আবার আধিপত্য বিস্তার করিতে যান, তাহা হইলে অভিমান, ক্রোধ, ক্ষোভ, দুঃখ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এমনই এক অন্তর্বিপ্লব ঘটায়, যে তাহার ফলে হয় সেই গুরুজনের, না হয় তাঁহার নিজের সংসার ত্যাগ করিয়া পলাইতে হয় এবং অনেক স্থলে শেষে অনুরাগে বৈরাগ্য বা সংসারে সন্ন্যাস আসিয়া পড়ে।

আপনাদের কেহ কেহ জানিতেও পারেন, যে কথাটার এক বর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়; আমি নিজে তো জানিই।— কারণ আমি "আস্বাদিতরসঃ", এবং তজ্জন্যই বলিয়াছি, 'স্বাদ রসের রসিক হইয়াই সাধুতা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

সে কথা যা'ক! এখন একটু আত্মপরিচয় দিতেছি। আপনারা সেটা অতি সংক্ষিপ্ত সূচনারূপে গ্রহণ করিবেন; না হইলে আমার এই বাক্যবিন্যাস বুঝিতে কষ্ট হইবে এবং এই— 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী'র সুদীর্ঘকালের সমস্ত পরিশ্রম নিরর্থক হইবে।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষা প্রণালী বহুদিন পূর্বে আরম্ভ হইলেও, আশা করি, আপনারা জ্ঞাত আছেন যে বঙ্গ ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটী দেশ, ২৪ পরগণা বঙ্গদেশের একটী জিলা, বিষ্ণুপুর তদন্তর্গত একটী পরগণা, তদন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে আমাদের আদিপুরুষ মহাত্মা রামরাম মিশ্র আসিয়া বাস করেন

অত গোড়ায় ধরিয়াছি বলিয়া কেহ শঙ্কিত হইবেন না। আজকালকার ওস্তাদশ্রেণী গায়কেরা সাধারণ একটা গান গাহিতে হইলেও যেমন একবার গোড়াপত্তে যাইয়া, রাগিণীটা একটু ভাঁজাইয়া তোয়াজ করিয়া নেবার চেষ্টা করে, পরে এক লাফে মাথায় উঠিয়া টক করিয়া গানটা ধরিয়া দেয়, এ ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া আমাকেও তেমনই করিতে হইবে। কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায়, এ পর্যন্ত পড়িয়া ইংরাজের রাণী এলিজাবেথের রূপপ্রণয়ী সার ওয়াল্টার র‍্যালের জন্মমৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত জানিলেও, পিতামহের উপরে আর দু'এক পুরুষের নামোল্লেখ করিতে পারি, এরূপ বিদ্যা দীক্ষা আমার নাই। ভগবানের ইচ্ছায় মিঃ প্যাটেলের অসবর্ণ বিবাহবিলটা একবার পাশ হইয়া গেলে, ও সবের বড় দরকারও দেখি না। শুধু সাদা চামড়া ধরিতে পারিলেই হয়। তখন কালো লোকের কুলজী নিয়া আর কি হইবে? আমরা সব মিঃ টুইডী বোনার্জি, মিঃ ডাট, মিঃ সেইন ইত্যাদি হইয়া যাইব।

তাই বলি,—শ্রীপুরের নামতো পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন—আমার পিতার নাম জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঐ গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। গৃহস্থহিসাবে আমাদের অবস্থাও ভালই ছিল; পৈতৃক তালুকে প্রায় ৩০০০৲ টাকা বার্ষিক আয় হইত এবং তাহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইত।

বাল্যকাল হইতেই আমার পড়াশুনার উপর পিতৃদেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আমিও ছেলে মন্দ ছিলাম না। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে করিতে যখন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম, তখন আমার গৌরব দেখে কে! আমি একজন বড় লীডার হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন উদার মহান্ ছাড়া ভাবই দেখিতাম না; সব বিষয়েরই ব্রাইট্ সাইড্ (উজ্জ্বল দিকটা) গ্রহণ করিতে বিশেষ কৃতিত্ব অনুভব করিতাম এবং তাহাই করিবার জন্য অযাচিতভাবে সকলকে উপদেশ দিয়া বেড়াইতাম; নিজে আইডিয়াল ক্যারেক্টার (আদর্শ চরিত্র) খাড়া করিবার জন্ত সর্ব্বদাই মস্তক উন্নীত করিয়া চলিতাম। যদি কোন আন্দোলন উপস্থিত হইত, অমনি সকলের আগে তাহার ভিড় মাখিয়া নিজেই ক্যাপ্টেন (অধ্যক্ষ) হইয়া দাঁড়াইতাম। তাহাতে যে কি আনন্দ, কি গৌরব অনুভব করিতাম, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি ভাষার এমন সম্পদ নাই।

এই শুভক্ষণে আমাদের দ্বিতীয় শিক্ষক রামবাবুর উদ্যোগে স্কুলের নিকটেই 'বিষ্ণুপুর-সেবাসমিতি' নামে রামকৃষ্ণমিশনের একটী শাখা-সমিতি সংস্থাপিত হইল। জনসাধারণের একটী সভা আহ্বান করিয়া সেই সভায় প্রথমে রামবাবু, পরে সভাপতিরূপে হেড্ মাষ্টার মহাশয় উহার উদ্দেশ্য এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে উহার একান্ত

প্রয়োজনীয়তা সুন্দরভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। শেষে সমবেত সকলের মতানুসারে সভার মন্তব্য নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করা হইল :—

১। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা 'বিষ্ণুপুর সেবাসমিতি" নামে রামকৃষ্ণমিশনের একটী শাখাসমিতি সংস্থাপন করিলাম। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম্মালোচনা, চরিত্রগঠন ও অসহায়, আতুর এবং দরিদ্রগণের সেবা।

২। প্রত্যেক মাসে ইহার একটী করিয়া অধিবেশন হইবে এবং তাহার মন্তব্যানুসারেই মেম্বরগণ সভার কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

৩। এই সভার অধীনে একটী 'দরিদ্রভাণ্ডার' সংস্থাপিত হইবে এবং মুষ্টিভিক্ষা ও চাঁদাদ্বারা তাহাতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা অসহায় দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করা হইবে।

৪। প্রত্যেক মেম্বরকে মাসিক ।০ চারি আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে এবং দরকার হইলে সম্পাদকের নির্দেশানুসারে ঔষধ-পথ্যাদি দ্বারা দরিদ্র রোগিগণের সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে।

পরে ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রস্তাবে এবং অন্যান্য সকলের অনুমোদনে হেড্ মাষ্টার মহাশয়কে সভাপতি, রামবাবুকে সম্পাদক, [illegible] সহকারী সম্পাদক এবং স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ষাট জন ও সাধারণের মধ্যে চল্লিশ জন,— মোট একশত জন মেম্বর নিযুক্ত করা হইল এবং সেই দিন হইতেই সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল।

কাজটা যে অতি মহৎ তাহাতে কোন সংশয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই উহার বেশ সুফল ফলিতে আরম্ভ করিল। নিয়মিতরূপে

সভার কার্য্য পরিচালনা করিতে করিতে আমাদের মধ্যে একটা দয়া ও ধর্ম্মের স্রোত বহিয়া চলিল। প্রত্যেক রবিবার মুষ্টিভিক্ষা আদায় করিবার জন্য এবং শারদীয় ও বাসন্তী পূজার সময় জন সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা সকলে হরি-সংকীর্ত্তন করিয়া বাহির হইতে লাগিলাম, অভিভাবকেরা ক্রমশঃ আমাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সকলপ্রকারে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং দিন দিন আমাদের প্রতি সকলেরই ভক্তিশ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল।

দরিদ্রভাণ্ডারের অর্থ সাহায্যে ইতরভদ্র নির্ব্বিশেষে অনেক দীন হীন উপকৃত হইতে লাগিল। সাহায্যার্থে কেহ আবেদন করিলে আমরা অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রকৃত অবস্থা জানিয়া সংবাদ দিতাম এবং সমিতির মতানুসারে তাহার সাময়িক কি মাসিক একটা সাহায্য নির্দ্দিষ্ট হইত, ক্ষেত্রবিশেষে তাহা আমরাই যাইয়া দিয়া আসিতাম। এইরূপে সভার কার্য্য অতি সুন্দরভাবেই চলিতে লাগিল।

কিন্তু আমার পক্ষে ইহাতে একটু দোষও ঘটিল। উপকৃত ও অনুপকৃত—অনেকের নিকট প্রশংসা শুনিতে শুনিতে আমি একটু প্রশংসাপ্রিয় হইয়া পড়িলাম এবং সেবাসমিতির সহকারী সম্পাদকরূপে 'শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণ' হইয়া নিজের ব্যক্তিত্বটা একটু বিশেষত্ব বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। ফলে অভিমানটা আসিয়া পূর্ণমাত্রায়ই আমাকে আশ্রয় করিল এবং ক্রমশঃই আমি একটু স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনচেতা' হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

সহপাঠী ছাত্রদের মধ্যে আমার প্রধান সহকারী ও প্রকৃত বন্ধু

ছিল নরেশ। তাহার চরিত্রটাও প্রায় আমার ছাঁচেই গঠিত হইয়া উঠিল এবং কর্মসূত্রে তাঁহার জীবনটা আমার জীবনের সহিত এমন-ভাবে জড়িত হইয়া পড়িতে লাগিল যে, আমার কথা তুলিতে হইলেই তাহার কথা আসিয়া পড়ে। এই রকম আরও দুই এক জনের কথা ঘটনাক্রমে আসিয়া পড়িলে, আপাততঃ সেটাকে আপনারা আমাদের পারিবারিক সামগ্রীর ন্যায় পরিবারের [illegible] বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

—:০:—



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

নিতান্ত দুরবস্থ ভদ্রলোকদিগের মধ্যে নির্দ্দিষ্টভাবে যাঁহারা সেবা-সমিতির সাহায্য পাইতেন, উত্তরপাড়ার স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী তাঁহাদের অন্যতমা। মাসিক ৪৲ টাকা করিয়া তাহার সাহায্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি নিজেই তাহা দিয়া আসিতাম এবং তাঁহার অন্য কোন অভাবের কথা জানিতে পারিলে, তাহাও পূরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম।

তিনি প্রকৃত দয়ার পাত্রীই ছিলেন। তাঁহার চরিত্র এত সুন্দর, এত পবিত্র ও এত উন্নত ছিল যে, আমি তাহাতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং প্রায়শই মনে করিতাম, "ভগবান্ কেন এমন দেবচরিত্র লোককে এত কষ্ট দেন?"— স্বামী একটীমাত্র কন্যাসন্তান রাখিয়া অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছেন; সঞ্চিত অতি সামান্য যে টাকা ছিল, তদ্বারা এই দশ বৎসর অতিকষ্টে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া এখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে যাহার মুখ চাহিয়া এত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছেন, সেই একমাত্র কন্যা এই দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। 'এখন কি করিয়া তাহাকে পালন করিবেন, আর কি করিয়াই বা বিবাহ দিবেন' এই চিন্তাই সর্ব্বদা তাঁহাকে হতাশ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। তাই সততই তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিতাম।

একদিন স্কুলে সংবাদ পাইলাম "দীনেশ বাবুর স্ত্রী ভীষণ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া আছেন এবং এ পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসার কোনরূপ বন্দোবস্তই হয় নাই।"

সংবাদ পাইবামাত্র রামবাবু ও হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে এ বিষয় জানাইলাম। কিছুকাল পরে তাঁহারা দু'জনে আমাকে ও নরেশকে ডাকিয়া ৫৲টী টাকা আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "এ কার্য্যে আমরা তোমাদের দু'জনকেই উপযুক্ত মনে করি। তোমরা এখনি দীনেশবাবুর বাড়ী চলিয়া যাও; আমরা ডাক্তার বিপিনবাবুকে নিয়া শীঘ্রই যাইতেছি। তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই। কলেরা সেরূপ সংক্রামক ব্যাধি নয়; একটু সাবধান হইয়া চলিলেই উহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়।"

আমরা দু'জনে তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তখনই দীনেশবাবুর বাড়ী রওনা হইলাম। গ্রামের একপ্রান্তস্থিত ঐ বাড়ীতে আর কোন গৃহস্থ ছিল না, তবে উহার অতি নিকটেই আর দু'চার খানা বাড়ী ছিল। কন্যাটীকে নিয়া দীনেশবাবুর স্ত্রী একাকিনী সেই বাড়ীতে বাস করিতেন। তাঁহার একখানি মাত্র খড়ের ঘর ছিল। তাহার বারান্দায় তিনি পাক করিতেন এবং ভিতরে কন্যাটী নিয়া থাকিতেন। অবস্থানুসারে তাঁহাকে সকলের দ্বারেই উপস্থিত হইতে হইত; কিন্তু তাঁহার দ্বারে কেহ বড় উপস্থিত হইত না।

আমরা যাইয়া দেখি, দীনেশবাবুর স্ত্রী একখানা মলিন বিছানার উপর পড়িয়া রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন;— নাড়ী নাই; বাহ্য প্রস্রাব বন্ধ হওয়ায় পেট ফাঁপিয়া উঠিয়াছে; সর্ব্বশরীর যেন হিম; ঘর্ম নির্গত হইতে হইতে শরীরেরও শয্যায় মল মিশ্রিত হইয়া এমনই একটা

বীভৎস আকার করিয়া তুলিয়াছে, যে তাহা দেখিলে সকলের মনেই ভীতি ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। তাহাতে দশপনরমিনিটকালব্যাপী এক একটা ভীষণ তন্দ্রা আসিয়া স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া দিতেছে যে মহানিদ্রা আসিতে বড় বিলম্ব নাই। মেয়েটী শিয়রে বসিয়া অশ্রুপূর্ণ আকুল লোচনে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়া মায়ের অন্তিম স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু মায়ের কর্ণে সব সময় সে কাতর আহ্বান পৌছিতেছে না।"

এইরূপ অতি-দীর্ঘকালব্যাপী একটা তন্দ্রার সময় ডাকিয়া কোন সাড়া না পাইয়া মেয়েটী আমাদের দিকে অতিশয় করুণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া, যেন "তাহার এই উপায়হীন অবস্থায় আমরা কোন উপায় করিয়া দিতে পারি কিনা, তাহাই" জিজ্ঞাসা করিল। তাহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না,— 'বলি' 'বলি' করিয়া বলিতেও পারিল না, কেবল আনতমুখে মনের গভীর বেদনায় ফাঁফিয়া ফাঁফিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তন্দ্রাশেষে মেয়ের অবস্থা দেখিয়া মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া নিলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে, জড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "প্রভা! আর কাঁদিস্ না মা! ভগবান্ তোর সকল দুঃখ মোচন করিবেন। ঐ দেখ নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিরুপায়ের উপায়, কৃপাময় দীনবন্ধু তোর সাহায্যার্থে কাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন!" এই বলিবামাত্র আমাদের প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভাও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; বলিলাম, "প্রভা! তুমি কাঁদিও না; যখন আমরা আসিয়াছি, তখন তোমার

মায়ের চিকিৎসা কি শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইবে না ; ভগবানের ইচ্ছায় তিনি সারিয়া উঠিবেন। রামবাবু ও হেড্‌মাষ্টার মহাশয় ডাক্তার বিপিনবাবুকে নিয়াই আসিতেছেন। বলিতে বলিতেই দেখি, তাঁহারা তিন জনে আসিয়া পৌছিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে বসিতে দিয়া আদেশের অপেক্ষায় সরিয়া দাড়াইলাম।

তখন বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবু রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "কেস্‌টা অত্যন্ত সাংঘাতিক তবে ২৪ঘণ্টা কাটিলে জীবনের আশা করা যায়। যাহাহউক, এখন চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ;— আপনারা পরিস্কার একটা বিছানা করিয়া রোগীকে আস্তে আস্তে ধরিয়া তাহাতে সরাইয়া নিন্ এবং একটা আগুন জ্বালিয়া উঁহাকে স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করুন"।

ডাক্তারবাবুর নির্দেশানুসারে ঘরের অপর পার্শ্বে পরিষ্কারভাবে আর একখানা বিছানা করিয়া আমি, রামবাবু ও মহেশ তিনজনে মিলিয়া অতিসাবধানে তাহার উপরে রোগীকে সরাইয়া নিলাম এবং পূর্ব্বের বিছানাটা পরিস্কার করিয়া একটা আগুন জ্বালিয়া যথানিয়মে স্বেদ দিতে লাগিলাম। ডাক্তারবাবু নিজেই ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন। তখন পাড়ার কয়েক জন লোক আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন এবং নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অব্যবস্থার বিশেষভাবে সমালোচনা করিতে লাগিলেন; যেন অসহায়া অর্থহীনা বিধবার এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের একটা কিছু বন্দোবস্ত করিয়া রাখা উচিত ছিল।

বেলা শেষ হইতে লাগিল; রোগীর অবস্থাও খারাপ হইতে লাগিল। ক্রমে বেগতিক দেখিয়া প্রতিবেশী ভদ্রলোকেরা একে একে

সরিয়া পড়িলেন ; —কেহ আশ্বাস দিয়া গেলেন "রাত্রির মধ্যে কোন ভয়ের কারণ নাই" ; কেহ বা বলিয়া গেলেন "তামাক খাইয়া আসিতেছি" কেহ বা স্মরণ করাইয়া দিলেন "সায়ংসন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইতে চলিল"। আমরা সকলের কথাই অগত্যা স্বীকার করিয়া নিলাম এবং নিতান্ত অলস অকর্ম্মণ্য মূর্খের ন্যায় বসিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই রোগীর তন্দ্রা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উঠিল এবং ডাকিলে তিনি সংজ্ঞাহীনভাবে জড়িতকণ্ঠে কচিৎ 'হ্যাঁ' শব্দে মাত্র সাড়া দিতে লাগিলেন। তখন সকলেরই মনে হইল দেহত্যাগ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই, সকলেই অত্যন্ত হতাশ হইয়া তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বালিকা হইলেও প্রভার কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। সে মায়ের মুখের উপরে মুখ দিয়া শোকাকুলহৃদয়ে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। শেষে কোনরূপ সাড়া না পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহার চোক মুখ নীল বর্ণ হইয়া গেল এবং সর্ব্ব শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় আমরা সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। মায়ের অন্তিম কাল উপস্থিত, হয়ত এখনই ধরিয়া বাহির করিতে হইবে। এদিকে বালিকা মেয়েও হতজ্ঞান হইয়া মায়ের অনুগমন করিতে বসিয়াছে। উভয়ের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সতর্কতার অভাবে যদি কাহারও জীবনের হানি হয়, তাহা হইলে সে দুঃখ রাখিবার আর স্থান হইবে না।

বিপদের সময় [illegible]বাবু কোন দিন বিচলিত হইতেন না,—বেশ ধীর-স্থিরভাবে কাজ করিতে পারিতেন। তাই তিনি আমাকে [illegible]

করিয়া বলিলেন "দেখ মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ তোমরা কখনও বিশেষ লক্ষ্য কর নাই, তৎপূর্ব্বকর্ত্তব্য কোন দিন করও নাই; সুতরাং তোমাদের আর এদিকে থাকার দরকার নাই; প্রভাকে একটু সরাইয়া নিয়া উহার যাহাতে সংজ্ঞালাভ হয়, তোমরা দু'জনে তাহাই কর;—উহার চোখে মুখে একটু জলের সেক দাও এবং মাথাটায় একটু বাতাস কর। আমরা উহার মাকে দেখিতেছি।"

তখন আর বিচার বিবেচনা করিতে গেলে চলে না,—কর্ত্তব্য-বোধের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে হাত দিতে হয় বলিয়া, আমি নরেশকে জল আনিতে বলিলাম এবং প্রভাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় বাতাস দিতে লাগিলাম। নরেশ অবিলম্বে জল আনিয়া তাহার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তাহার চৈতন্যও হইল না; এমন কি কম্প বা ঘর্ম্ম কিছুই নিবারণ হইল না। কিছুকাল পরে সে যেন অত্যন্ত পিপাসায় মুখের জল একটু একটু করিয়া তল করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমার সংশয় হইল "হয় ত সারাদিন তাহার পেটে কিছুই যায় নাই।" তাই আমি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অনাহারে ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে কিনা!

আমার এই জিজ্ঞাসার ফলে ডাক্তারবাবু আসিয়া প্রভার পেট জিভ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "হাঁ, তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ তাহা ঠিক। সারাদিন অনাহারেও এইরূপ অবস্থা হইতে পারে;— [illegible] একটা রোগ বিশেষ।" এই বলিয়া তিনি উহার লম্বা রকমের [illegible] নাম করিলেন, তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারি নাই; [illegible] আমার মেধাও একটু কম, তেমন সে সময় মনটাও যেন

কেমন হইয়া গিয়াছিল। তাই উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "ডাক্তার বাবু! ইহার প্রতিকারের উপায় কি?" তিনি অন্যমনস্ক-ভাবে উত্তর করিলেন "ভাত কচলাইয়া সেই জল দিতে পারিলে ভাল হইত।"

আমার কিন্তু সে ভাবটা ভাল লাগিল না! শত্রু হইলেও নরেশ আমার বন্ধু! সে তাহা বুঝিয়া নিল এবং তাড়াতাড়ি পাকের বারান্দায় ঢুকিয়া বলিল "একজনের মত বাসী ভাত এখনও হাড়ীতে আছে; আমি তাহা কচলাইয়া জল আনিয়া দিতেছি।" শুনিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম।

কিছুকাল পরে নরেশ ভাতের জল নিয়া উপস্থিত হইল। তাহার একটু একটু করিয়া প্রভার মুখে দিতে দিতে সে আধ ঘন্টার মধ্যেই পাশ ফিরিয়া শুইল, কিন্তু বোধ হয়, অত্যন্ত অবসাদের জন্যই, আর চক্ষুরুন্মীলন করিতে পারিল না। তখন তাহার জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই মনে করিয়া তাহাকে ভিন্ন স্থানে শোয়াইয়া, কিছুকাল বাতাস করিতেই সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল, মায়ের অবস্থা আর স্মরণ করিতে পারিল না।

ধন্য নিদ্রাদেবী! ধন্য তোমার মহিমা! অসময়ে যদি তোমার শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় না দিতে, তাহা হইলে হতাশেই কত লোক মরিয়া যাইত! তোমার দয়ার, তোমার স্নেহের, তোমার দানের প্রতিদান নাই। যদি জননী জন্মভূমি হইতেও গরীয়সী কেহ থাকে, তবে সে তুমি;—মানবজীবনে শান্তি নামে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা তোমার ক্রোড়ে! কারণ সুখ দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, জীবন-মরণ ইত্যাদি সকল অবস্থাকেই সকলকে মায়ের অধিক স্নেহে, তোমার বুকে টানিয়া

লও এবং আপন মায়ায় ভুলাইয়া কিছুকাল শান্ত করিয়া রাখিয়া, তোমার সঞ্জীবনী সুধা দানে পুনরুজ্জীবিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আবার ছাড়িয়া দাও। জননী, জন্মভূমি উভয়ের অন্তরেই অবস্থাবিশেষে সমদর্শিতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তোমার অন্তরে অভাব তো দূরের কথা, সমদর্শিতার একমাত্র স্বভাবটাই অনুভূত হইয়া থাকে। মা আমার এই একমাত্র প্রার্থনা "যেন তোমাকে কেহ কোনদিন না হারায়।"

ইহাতে মনে করিবেন না যে "আপনারা কুম্ভকর্ণের ন্যায় পড়িয়া কেবল ঘুমান" আমি এই প্রার্থনা করিতেছি। সে ছিল বড় লোক,—তার পক্ষে সেটা মানাইত! আপনারা ত আর তত বড় লোক নন,—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণও আসিয়া আপনাদের কাজ করিয়া দেয় না; তাই আপনাদের পক্ষে সেটা শোভা পায় না। আর আপনারাই যদি সারা দিন পড়িয়া কেবল ঘুমান, তাহা হইলে জাগিবে কে? আর কেইবা আমার ন্যায় লোকের জীবনচরিত পাঠ করিয়া সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিবে?

আরে! নানা! শ্রীবিষ্ণুঃ! দেখুন কি বলিতে যাইয়া কি বলিতেছি;—কথা বলিতে গেলেই আমার এইরূপ এক একটা ভাব আসিয়া পড়ে। যাহা হউক, ইহাতে অন্যায় কিছু মনে করিবেন না; আমার এমন আবেগটা সব সময় সামলাইয়া উঠিতে পারি না বলিয়াই মাঝে মাঝে দু' চারটা বাজে কথা বলি! আমার ঠাকুরমা যখন গল্প বলিতে আরম্ভ করিতেন, তখন ঘুমাইয়া পড়িলেও ছাড়িতেন না,—"আরে শোন, আরে শোন" বলিয়া টানিয়া তুলিতেন। আমি তো তাঁরি প্রিয় শিষ্য,—যখন আরম্ভ করিয়াছি, ভালই হউক, আর

মন্দই হউক, তখন শেষ না করিয়া ছাড়িতেছি না। নীতিশাস্ত্রেও তাহাই করিতে বলে "আরব্ধমুত্তমগুণা ন খলু ত্যজন্তি"।

কি যেন বলিতেছিলাম? হঁা! নরেশ আসিবার সময় বাড়ীতে সংবাদ দিয়া আসে নাই। রাত্রি ৮টার পরেও সে ফিরিল না দেখিয়া তাহার পিতা শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায়মহাশয় ঠিক ধরিয়াছেন এবং তাহার অনুসন্ধানে আসিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্যামাচরণবাবু বিচক্ষণ বুদ্ধিমান অথচ অতি সৎলোক। তাঁহার দোষের মধ্যে এই যে, তিনি নরেশের চরিত্রটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সমালোচনা করিতেন এবং সব বিষয়েই একটু অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতে যাইতেন। গ্রামের ভিতরে 'মারীভয়' উপস্থিত হইলে তিনি নৈশভোজন তো পরিত্যাগ করিতেনই মধ্যাহ্নভোজনের সময়ও লঘুপাক জিনিষ ভিন্ন গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না।

ছেলেকে দেখিয়া তাহার এই অসমসাহসিকতায় তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। হেড মাষ্টার মহাশয়, রামবাবুর সমক্ষে বিশেষ কিছু বলিতে না পারিয়া সামাজিকতার খাতিরে কিছুকাল সেখানে বসিয়া রহিলেন; পরে অতি আস্তে আস্তে এইমাত্র বলিলেন "আমার স্ত্রীর অসুখ;—নরেশ বাড়ী না গেলে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইবে।"

রামবাবু অবস্থা বুঝিয়া হেড মাষ্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া একটু হাসিতেই তিনি শ্যামাচরণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তাহা হইলে আপনি নরেশকে নিয়া যাইতে পারেন; আমরা চার জন যখন আছি, তখন নরেশ রাত্রে না থাকিলেও চলিতে পারিবে।" শুনিয়া "আচ্ছা! তবে আমরা আসি; এস নরেশ" বলিয়া শ্যামাচরণ বাবু উঠিয়া চলিলেন। নরেশ অতিশয় ক্ষুণ্ণমনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

তখনও নরেশ আমাদের ন্যায় স্পষ্টবাদী হইতে না পারায় অনেক সময়েই তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে হইত; তাহাতে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও মুখে সে কিছুই প্রকাশ করিত না। এই জন্য, আর সামান্য একটু কুটিলতার ফলে তাহার অন্তরের কোমল বৃত্তিগুলি অনেক সময় বিফল হইয়া যাইত,—দিতে যাইয়াও তাহার পরিচয় দিতে পারিত না। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল বলিয়া তাহাকে ক্ষমা না করিয়া পারিলাম না।

যাহা হউক,—এক এক করিয়া সকলেই আমাদের ছাড়িয়া চলিল দেখিয়া দীনেশবাবুর স্ত্রী সে রাত্রিতে আর আমাদের ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। ন'টার পর হইতেই তাহার অবস্থা একটু ভালর দিকে চলিল। একবার বাহ্য হইয়া পেট ফাঁপা অনেকটা কমিয়া গেল। শরীরের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত নাড়ীও আবার দেখা দিল। তখন ঔষধে প্রকৃতই কাজ করিয়াছে দেখিয়া ডাক্তারবাবু উৎসাহের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। রাত্রিশেষে রোগীর অবস্থা সম্পূর্ণ ফিরিয়া গেল। তখন একবার প্রস্রাব হওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ করিয়া "আমার প্রভা কোথা? প্রভা! প্রভা!" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন।

সেই ডাকে প্রভার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চমকিয়া উঠিয়া ব্যস্ত-ভাবে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি মা! এখন কেমন আছ?"

তিনি উত্তর করিলেন "কে? প্রভা! মা! আমি এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছি। এবার আর তোর কোন চিন্তার কারন নাই; ইহাদের অনুগ্রহে আমি, বোধ হয়, বাচিয়া উঠিলাম।—ভগবান্

ইঁহাদের মঙ্গল করুন।" এই বলিয়া তিনি প্রভাকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল তুই কি কিছু খাইয়াছিলি ?"

শুনিয়া হেড্ মাষ্টার মহাশয় উত্তর করিলেন "হাঁ, বাসীভাত যাহা ছিল, প্রভা তাহাই খাইযাছে। উহার জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না ; আমাদের কেহই উহাকে ফেলিয়া আহার করিতে পারিবে না।" ডাক্তারবাবুও হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন "আপনি কোন চিন্তা করিবেন না ; আপনার শরীর দুর্বল—বেশী কথাও বলিবেন না।"

তাঁহাদের কথা শুনিযা দীনেশবাবুর স্ত্রী নীরব হইয়া রহিলেন পরে আশ্বস্তভাবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন ; প্রভা কাছে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

—:০:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইল।—আপনারা বিচলিত হইবেন না—প্রাতঃ প্রভাতবর্ণনা করিতে যাইতেছি না। আমার শক্তি থাকিলেও উহাতে আর রুচি মোটেই নাই, কারণ আজকাল উহার নূতনত্ব তো কিছুই নাই, বরং উহা অত্যন্ত প্রাচীন ও ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক হইয়া পড়িয়াছে।—সেই অতিপুরাতন কথা। অরুণোদয়, সেই মাধবীলতার আনন্দের মৃদুমন্দ প্রাতঃসমীরণ, সেই নানা রঙের কুসুম সুবাস, সেই একঘেয়ে বিহঙ্গকূজন ভ্রমরগুঞ্জন এখন আর কাহারও মনোরঞ্জন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে জিনিস যত প্রাচীন হয়, ততই আধ্যাত্মিক হইতে থাকে, শেষে তাহার তত্ত্ব সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এমন অবস্থায় যাইয়া পৌঁছিয়া পর্য্যবসিত হয়, যে তাহার ভাব অভাব দুই সমান হইয়া পড়ে। তখন তাহার ভাবের চেয়ে অভাবটাই নিরুপদ্রব বলিয়া মনে হয়। তাই ওসব পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক পূর্ব্ব প্রসঙ্গই তুলিতেছি।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় যে সব প্রতিবেশী ভদ্রলোক বিশিষ্ট প্রয়োজনে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা একে একে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কোন আড্ডা আছে কিনা জানিনা, তবে একে একে গমন, এক সময় অতিবাহন ও একের পর অন্যের আগমন দেখিলে মনে অন্ততঃ একটু সংশয় না জন্মিয়া পারে না।

যাহা হউক, তাঁহাদের কাহারও এমন অসুখ করিয়াছিল যে, তাহার গ্লানি সে পর্য্যন্তও না যাওয়ায় তিনি কোকাইতে কোকাইতে আসিয়া বসিয়াছেন; কাহারও মাথাধরা তখনও আছে বলিয়া, মাথায় গামছা বাঁধিয়া আসিয়াছেন; কেহবা রাত্রে আহারান্তে, আসিবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, সঙ্গীর অভাবে আসিতে পারেন নাই, তাই অতি প্রত্যূষেই উঠিয়া আসিয়াছেন। তাহারা সমবেত হইয়া এইরূপ আত্মপরিহারান্তে আমাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ফলে আমাদের ধরিয়া নিতে হইল "তাহারা সকলেই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ - অতি সৎলোক।

ডাক্তারবাবু তখন আর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন বোধে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বাড়ী যাইতে চাহিলেন! মাষ্টারমহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে আমি টাকা ৫৲টী তাঁহার পারিশ্রমিকরূপে দিবার জন্য বাহির করিলাম। "এখনও আমি এত হীনপ্রবৃত্তি হইতে পারি নাই, যে মিশন ফণ্ডের টাকা গ্রহণ করিব; বরং ঐ টাকা দ্বারা রোগীর পথ্যাদির যোগাড় করুন" তিনি এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে দেখি নরেশ হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত "কি খবর" জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল "খবর ভাল; আমি যাবার অনুমতি নিয়াই আসিয়াছি।"

আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার মায়ের অসুখ সারিয়াছে?"

উত্তরে নরেশ কহিল "তাহা কি আর থাকিতে পারে? আমি বাড়ী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারিয়া গিয়াছে। আজ সকাল বেলা এখানে আসিতে চাহিয়া আমি বাবাকে বলিলাম "বিপন্ন আপদের

সময় আমরা অন্যের বাড়ী না গেলে, অন্যে আমাদের বাড়ী আসিবে কেন? আর আপনি যে ভয় করেন, অসুখের ভয়ে পলাইয়া কি কেহ সামলাইতে পারে? "তাহাতে নিরুত্তর হইয়া তিনি অনুমতি দিয়াছেন "দিনের বেলায় তুমি সেখানে যাইতে পার; কিন্তু সর্ব্বদা সাবধানে থাকিও।"

শুনিয়া হেড্ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "বেশ, তুমি আসিয়া ভালই করিয়াছ।(স্কুল টাইম) এর পরে ছাড়া আমরা আর আসিতে পারিব না, সুরেশও বাড়ী যাইয়া স্নানাহার করিয়া আসুক। এ পর্য্যন্ত ইঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তুমিই ঔষধ পথ্য দাও।" এই বলিয়া তিনি ও রামবাবু বাহির হইলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গ লইলাম।

পথে বড়ই চিন্তা হইল, বাড়ী গেলে বাবা কি বলেন। "আমি মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় গেলাম" পূর্ব্বদিন এইমাত্র সংবাদ দিয়া স্কুল হইতেই দীনেশবাবুর বাড়ী আসিয়াছি, পরের দিন বেলা ৮টার সময় বাড়ী ফিরিতেছি। ইহাতে তাঁহার নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইবারই কথা! তবে তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে,—সত্য কথা বলিলে সন্তুষ্টও হইতে পারেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, সদাশয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পরোপকারী লোক ছিলেন। পাড়ায় কাহারও অসুখ হইলে নিয়তই সে স্থানে থাকিয়া দেখাশুনা করিতেন। সকলেই সেই জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিত।

বাড়ী গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিলে বাবা আমাকে উল্টা অনুযোগ দিলেন "সংবাদটা আগে যেমন মাষ্টার মহাশয়দের জানাইয়াছিলে, তেমন আমাকেও জানান উচিত ছিল; তাহা হইলে আমি নিজেও যাইতে পারিতাম। যাহা হউক তোমার একার্য্যে আজ

সন্তুষ্টই হইয়াছি। এইত মানুষের কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া তিনি তখনই উত্তর পাড়া রওনা হইলেন।

আমি আর অপেক্ষা না করিয়া স্নান করিতে গেলাম। আসিয়া দেখি, মা আমার জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি খাইতে বসিলে তিনি একটু অনুযোগ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর খাওয়া দাওয়া তো যেন হইলেও হয়, না হইলেও হয়! বলেবার রোগী নিয়া যে সমস্ত রাত্রিটা কাটাইয়া আসিলি, তোর কি একটু ভয়ও হইল না?"

মা'র প্রাণ ত, আমি জানিতাম, তাই তাঁহাকে শান্ত করিতে আমার আর বেগ পাইতে হইল না। যেই প্রভা ও তাহার মা'র অবস্থা বিবৃত করিয়া বলিলাম, অমনি তাঁহার চোখে জল আসিল; তিনি বলিতে লাগিলেন "ভগবান্ তাহাদিগকে রক্ষা করুন! আহা! তাহার মা না বাঁচিলে প্রভার কি দশা হইবে? আচ্ছা, তাহার খাওয়ার কি বন্দোবস্ত হইয়াছে রে? তুই বরং যাবার সময় কিছু খাবার নিয়া যাস্।"

আহারান্তে আমি কিছুকাল বিশ্রাম করিলাম। তখনও বাবা ফিরিয়া আসেন নাই। "আমরা কেহ না গেলে তিনি আসিতে পারেন কিনা" এই সংশয়ে আমি মা'র নিকট যাইয়া বলিলাম, মা! আমি এখন আবার যাইয়া বাবাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেই। "হাঁ, তুই গিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দে, এখন স্নানাহারের বেলা উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে।" এই বলিতে বলিতে তিনি একটী ন্যাকড়ার পুট্‌লী আনিয়া আমার হাতে দিয়া পুনরায় বলিলেন, "প্রভার জন্য এই খাবার নিয়া যা"।

আমি তখনই রওনা হইলাম। যাইয়া দেখি নরেশ মাত্র প্রভার মা'র কাছে বসিয়া আছে; আর কেহই উপস্থিত নাই। বাবা এখানে আসিয়াছিলেন না? তিনি গেলেন কোথা?" আমি এই কথা নরেশকে জিজ্ঞাসা করায় প্রভার মা কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "দুটী খাওয়াইয়া আনিবার জন্য তিনি প্রভাকে নিয়া বাহির হইয়াছেন। আহা! বাছা আমার কাল রাত্রে ক্ষুধায় নাকি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল! তোমরা না আসিলে কাল্‌কে আমাদের যে কি দশা ঘটিত, তাহা ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়। বাবা নরেশ! তুমি এখন গিয়া খাওয়া দাওয়া কর। এই হতভাগিনীর জন্য তোমরা কত কষ্টই না পাইলে! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ভগবান যেন চিরদিন তোমাদের অন্তরে থাকিয়া আমার ন্যায় নিঃসহায় দরিদ্রদের দুঃখ মোচন করেন।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিল; তিনি চোখ মুছিয়া তদ্‌গত-চিত্তে নীরব হইয়া রহিলেন।

"তাঁহাকে কোন পথ্য দেওয়া হইয়াছে কিনা?" নরেশকে এই প্রশ্ন করায় তিনিই আবার বলিতে লাগিলেন "যেমন বাপ, তেমনি ছেলে! তিনি আসিয়াই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে নিজ হাতেই বার্লি তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। পরের দুঃখে যদি তোমাদের ন্যায় সকলেরি প্রাণ কাঁদিত, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইত।"

আবেগভরে তিনি আরও কত কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, আমি মাঝে বাধা দিয়া বলিলাম 'যে যার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছে তাহাতে আর প্রশংসার বিষয় কি আছে? আপনার শরীর নিতান্ত

দুর্বল আপনি আর কথা বলিবেন না ; যাহাতে একটু নিদ্রা যাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন।” তিনি তখন আর কোন কথা না বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। আমি নরেশকে বিদায় দিয়া তাঁহার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

ইতোমধ্যে বাবা প্রভাকে নিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ? “তোমার আহারাদি হইয়াছে ?” আমি উত্তর করিলাম “হাঁ! হইয়াছে, মা এখনি আপনাকে বাড়ী যাইতে; বলিয়া দিয়াছেন।”

“হাঁ, যাইতেছি। প্রভারও খাওয়া হইয়া গিয়াছে। এখন তোমরা দু'জনে এখানে বস ; আমি বৈকালে আর একবার দেখিয়া যাইব।” এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। প্রভা একটু দূরে মায়ের কাছে যাইয়া বসিল।

তখন প্রভা নিজের স্বাতন্ত্র্যটা যেন সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল। পরমহিতৈষী গুরুজনের কথা মনে করিয়া, সে আমাদের সকলের কথাই নিরাপত্তিতে প্রতিপালন করিত ; কোন সময় বা আদেশের পূর্ব্বে ইঙ্গিতমাত্রেই কাজ করিয়া যাইত। মুখে কোন কথাই বলিত না। লক্ষ্য করিলে অনুমান হইত, যেন সে অত্যন্ত ধীরপ্রকৃতি ও অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তাই নিজের অবস্থাটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং নিজের যে তাহার প্রতিকারের সামর্থ্য মোটেই নাই, তাহা কার্য্যতঃ দেখিয়া আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছে। তাহার উদাস অন্তর্দৃষ্টি দেখিলে বোধ হইত কৃতজ্ঞতাভরে সে যেন আরও দূরে ভগবানে আত্মসমর্পন করিয়া নিজে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া আছে।

সে এই অবস্থায়, একটু দূরে, বিছানার এক পার্শ্বে বসিয়া নিদ্রিত মায়ের মুখপানে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। তখন তাহার প্রশান্তসুন্দর বদনমণ্ডল দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল যেন উহা হইতে সুন্দর, জগতে আর কিছুই নাই। তাই আমি মুগ্ধ হইয়া উহার সৌন্দর্যই উপভোগ করিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে এমনি একটা সহানুভূতি আসিয়া পড়িল যে আমিও ঠিক প্রভার ভাবনাই ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে আমার চিন্তাশক্তির সীমান্তে উপনীত হইয়াও তাহার শেষ পাইলাম না। শেষে উভয়েই যেন হতাশ্বাস হইয়া পড়িলাম এবং একে একে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চিন্তার স্রোত ফিরাইয়া দিতেই প্রভার মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি প্রভাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমের খাওয়া হইয়াছে মা?"

প্রভা উত্তর করিল, "হাঁ, হইয়াছে।" শুনিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমরা বন্ধুহীন বলিয়া ভগবান্ আমাদের যে সব বন্ধু মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, "আমি মরিয়া গেলেও তোর একটা কিছু উপায় হইবে।"

তখন আমি বলিলাম, "আপনি অমন কথা মুখে আনিবেন না। এ যাত্রায় আপনার আর ও সব চিন্তার কারণ নাই;—এখন দু'চার দিনের মধ্যেই আপনি সারিয়া উঠিবেন।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতেই রামবাবু ডাক্তারবাবুকে নিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারবাবু রোগীর অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন; পরে গোপনে আমাদের নিকট বলিলেন, "এখনও সম্পূর্ণ ভরসা করা যায় না। কৃমিবিকারের আশঙ্কা

জন্মিয়াছে, যদি এই আশঙ্কা কাটিয়া যায়, তাহাহইলে বুঝিলাম পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।"

তখন বেলাপ্রায় পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। বাবা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সুরেশ তুমি এখন বাড়ী যাও; আজও তোমার রাত্রি-জাগরণ করা সঙ্গত না। আজ রাত্রে আমি নিজেই এখানে থাকিব বলিয়া আসিয়াছি; তোমার আর থাকার দরকার নাই।" রামবাবুও তাহাই করিতে বলিলেন। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া তখনি রওনা হইতে হইল।

আপনারা হয়ত ধরিয়া বসিবেন, তাহা হইলে আমার ব্যক্তি-স্বাভিমান কি স্বেচ্ছাচারিতাটা কোথায় রহিল? কি করি? সব সময় দেখাইতে না পারিলেও, যে সব গুণের কথা বলি, তাহা আমাদের আছে বলিয়া জানিবেন, নিজেদের কথা নিজেরা বলি বলিয়া কোনরূপ সংশয় করিবেন না। আজকালকার লোক, সাধারণের—বিশেষতঃ কথক ও লেখকের সম্বন্ধে—এমনি কৃপণ যে, টাকা পয়সা ত দূরের কথা, মুখের দু'টা কথা ব্যয় করিয়াও একটু সাহায্য করিতে চায় না। কাজেই নিজেদের বিজ্ঞাপন নিজেরা দিয়া প্রচার প্রতিপত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়। সুতরাং এ সব আর ধর্তব্যের মধ্যেই আনিবেন না—শুধু শুনিয়া যাইবেন মাত্র।

বাড়ী যাইয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। আমাদের একখানা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বই ছিল, তাহা খুলিয়া বসিলাম। ডাক্তারবাবু কৃমিবিকারের কথা বলিয়াছিলেন, তাহার লক্ষণ কি, পরিণামই বা কি ইত্যাদি বিষয় উদ্বিগ্নচিত্তে দেখিতে লাগি-

লাম। তখন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুরুত্ব বুঝিয়া ডাক্তারি পড়িবার জন্য বড়ই আগ্রহ জন্মিল। ভাবিলাম, মনুষ্যত্ব থাকিলে ডাক্তারদের দ্বারা অসীম মঙ্গলকার্য্য সাধিত হইতে পারে।

এইরূপ অনেক ভাবনা চিন্তার পর আহারান্তে শয়ন করিলাম। রাত্রিশেষে স্বপ্নে দেখি, "আমি ও প্রভা যেন ভাসিতে ভাসিতে অকূল সাগরে আসিয়া পড়িয়াছি; চতুর্দ্দিকে অনন্ত জলরাশি আমাদের দু'জনকে গ্রাস করিবার জন্য ভীষণ গর্জ্জনে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে; আমরা কোন আশ্রয়স্থল না পাইয়া দু'জনে মিলিয়া অকূলকাণ্ডারী শ্রীহরিকে ডাকিতেছি। এমন সময় কে যেন গাহিয়া উঠিল—

"আমি অকূলকাণ্ডারী হরি তুলে নিব, আয়।
ওগো? তোদের ভয় কিরে তায়।"

গানটা শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বুঝিলাম নরেশ গাহিতে গাহিতে আমাদের বাড়ী আসিতেছে। তথাপি স্বপ্ন ও ঘটনার অপূর্ব্ব মিলনে আলো ও আঁধারময় এমনি একটা ভবিষ্যৎচিত্র মানসপটে অঙ্কিত হইতে লাগিল যে, আবার স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমি তাহার ভীষণ মাধুর্য্য অনুভব করিতে লাগিলাম। যখন নরেশ আসিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিল, তখন আমার সেই জাগ্রৎস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। আমি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া আবার বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

নরেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এখনও তোমার ঘুমের ঘোর যায় নাই দেখিতেছি।" "এ ঘোর বোধ হয় জীবনেও যাইবে না" বলিয়াই আমি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। তখন একথা

চাপা দিবার ছলেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এত সকালে যে?
সে উত্তর করিল "আজ তোমার আমার প্রায় একই দশা জানিয়া ভারি স্ফূর্ত্তি হইয়াছে; তাই আবেগটা দূর করিবার জন্য এত সকালে আসিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি করিয়া জানিলে যে আমি গত রাত্রে বাড়ী আছি?"

উত্তরে সে যাহা বলিল তাহা শুনিলে, বোধ হয়, আপনারাও একটু হাসিবেন। সে বলিল "বাবার স্বভাব তো জানই;—রাত্রে আমাকে কোথাও থাকিতে দিবেন না, অথচ প্রভাদের বাড়ীর সংবাদটা জানিবার একান্ত ইচ্ছা। কি করি! শেষে এক যুক্তি করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এক ফাঁকে বাহির হইয়া পড়িলাম, রাত্রি ৮টার পূর্ব্বেও আর ফিরিলাম না।

বাবা প্রথমে অনেক গালাগালি করিলেন; শেষে অপত্যস্নেহের দায়ে ঠিক প্রভাদের বাড়ী গিয়াই উপস্থিত হইলেন,—কলেরার ভয়ে আর তাঁহাকে আটকাইতে পারিল না। সেখানে গিয়া দেখেন "আমি যাই নাই"। কাজেই সেখানকার সংবাদ নিয়া তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইল। ফলে তাঁহার মুখেই সব সংবাদ পাইলাম।"

"তুমি এ ধূর্ত্ততা কোথায় শিখিলে" একটু কোপন দৃষ্টিতে হাসিয়া আমি এই প্রশ্ন করিলে, সে ঠিক সেই ভাবেই উত্তর করিল "শিখিয়াছি আবশ্যকতার কাছে।" পরে যেন আমাকে শান্ত করিবার জন্যই বলিতে লাগিল "দেখ ভাই! ধূর্ত্ততা জিনিষটা বড়ই উপাদেয়। এত দিন উহার রস পাই নাই, আজ পাইয়া বড়ই আমোদ অনুভব করিতেছি; তাই ভোরে ঘুম ভাঙ্গিবামাত্রই ক্ষণকাল অপেক্ষা না করিয়া তোমার ন্যায় বন্ধুজনকে তাহার ভাগ দেওয়ার জন্য ছুটীয়া আসিয়াছি।

তাহার কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল; আমি তাহার মুখের দিকে কিছুকালের জন্য চাহিয়া রহিলাম, শেষে তাহার ভাব দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দে হাসিতে লাগিলাম। এবং তাহার এই সদিচ্ছামূলক ধূর্ত্ততার জন্য মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম "সময়ে সব আবশ্যক হয়। যাহা হউক, আজ যেমন তুমি আমাদের নূতন ভাগটা দিবার জন্য ভোরে উঠিয়াই চলিয়া আসিয়াছ, চিরদিন কি এইভাবে নূতনটার ভাগ দিতে পারিবে?"

নরেশ হাসিয়া উত্তর করিল "আচ্ছা, সে কথা পরে দেখা যাইবে; এখন চল, হাতমুখ ধুইয়া বাহির হই।" তখন উভয়ে আমার শয়ন ঘর পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইলাম।

—————— ⁘ ——————

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:*:—

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, —আপনারা ভুল করিবেন না যে, আমি স্নানাহ্নিকের কথা বলিতেছি। পিতৃপিতামহ চির দিন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই যে ওটা কম্পাল্‌ছরি(অবশ্য কর্ত্তব্য) হইয়া গিয়াছে, এরূপ প্রেজুডিস্ (কুসংস্কার) আমাদের ছিল না। আমরা জানিতাম "ইমিটেসনইজ এ সুইসাইড্" অর্থাৎ অনুকরণ আত্মহত্যা বই আর কিছুই নয়। তাই ফোটা কাটিবার পরিবর্ত্তে, টেরী কাটিতাম, কোশা কুশী ঠন ঠন্ করিবার পরিবর্ত্তে, পেয়ালা চামচা ঠুন্‌ঠুন্ করিতাম আজকাল এটাও ফ্যাসান্ ওটাও ফ্যাসান্; —তাহা হইলে আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন "এর কোনটা সুন্দর, —কোনটা মনোহর।" তথাপি কন্‌সারভেসন্ এণ্ড রিফরম্ পলিছি (সংরক্ষণ সংস্করণ নীতি) অনুসারে পিতৃপিতামহের ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে যে গুলি সুরুচিসঙ্গত এবং কুসংস্কার বিরহিত তাহা রাখিয়া দিয়া আর সব, না করিলে নয় বলিয়াই, রিফরমড্ (সংস্কৃত) করিয়া লিয়াছি।

আমাদের এই পলিসির কেহ নিন্দাও করিতে পারিবেন না, কারণ মহামহিমান্বিত ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টই এই পলিসির অনুসরণ করিয়াছেন এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া

আসিতেছেন। আমি যে এই সব অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলিতেছি, এ কেবল আপনাদেরই ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য। যদি এটা না করি, তাহা হইলে আপনারা বোদ্ধব্য বিষয়ই বুঝিতে পারিবেন না! আমার ত পণ্ডশ্রম আছেই।

যাহা হউক, এখন আর বোধ হয় বুঝিতে ভুল করিবেন না--"প্রাতঃ-কৃত্য সমাপন করিয়া" আমরা দু'জনে যাইয়া প্রভাদের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি "রোগীর অবস্থা একরূপই আছে; বাবা, ডাক্তারবাবু ও রামবাবু আমাদেরি অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।"

আমরা উপস্থিত হইতেই ডাক্তারবাবু বলিলেন "এখন তোমরা এখানে বস; আমরা এবার আসি। আজ সময়মত এই ঔষধ-গুলি দিবে; নূতন কোন উপসর্গ উপস্থিত না হইলে, আজ আর আমি আসিব না। রামবাবু! আপনিও চলুন; এই দুইরাত্রি জাগরণের পর শরীরটা অন্ততঃ একটু শোধরাইয়া নিন্।"

তখন রামবাবু আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "আজ রাত্রে যদি তোমরা দু'জনে এখানে থাকিতে পার, তাহা হইলে আমি আর আসিব না।" আমরা তাহাতে স্বীকৃত হওয়ায় তিনি ডাক্তারবাবুকে নিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল পরে বাবাও প্রভাকে নিয়া চলিয়া গেলেন। এইমাত্র বলিয়া গেলেন "আর কেহ না আসিলে, তোমরা এক এক করিয়া খাইয়া আসিও।"

আমরা দু'জনে যথাবিধানে রোগীকে ঔষধপথ্য দিয়া বেলা ১২টার পূর্বেই এক এক করিয়া আহারাদি করিয়া আসিলাম। বৈকালে বাবা প্রভাকে নিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রোগীর অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না দেখিয়া বলিলেন "আর কোনরূপ

প্রবঞ্চক ও খলপ্রকৃতির এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, যাহাদের কথা ভাবিলেও ঘৃণার উদ্রেক হয়; আবার ইংরাজীশিক্ষায়শিক্ষিত, সন্ধ্যা-আহ্নিকবিবর্জ্জিত, যথাকথিত নাস্তিকদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, যাহাদের চরিত্রে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা হউক, সে কথায় প্রয়োজন কি? এখন আর সমালোচকের অভাব নাই; তাহাদের চ'ক্ষে সবই পড়িয়া থাকে।

হাঁ! যাহা বলিতেছিলাম,—ভগবানের প্রতি একটা ভক্তি আসিয়া পড়িল এবং কিছুকালের জন্য তন্ময় হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলাম। হঠাৎ প্রভার মা "আমি উঠি, উঠি" করিয়া উঠিতেই আমার ধ্যান ভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিলাম, বস্তুতই তিনি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছেন।

তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম "আহা! না আপনি উঠিবেন না। আপনার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, উঠিলে পড়িয়া যাইবেন। তথাপি তিনি কিছুকাল উঠিতে চেষ্টা করিয়া, শেষে আবার শুইয়া পড়িলেন। আর কেহই ইহা জানিতে পারিল না। আমি বুঝিলাম, যে এ 'ডেলিরিয়ম' এর সিম্‌টম্; তবু কাহাকেও ডাকিলাম না। ভাবিলাম "দেখি, কি হয়।"

কিছুকাল পরে আবারও তিনি উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে উৎসুকভাবে কি যেন হাতরাইতে লাগিলেন। তখন আমার একটু ভয় হইল; আমি নরেশকে ডাকিলাম এবং দু'জনে মিলিয়া অনেক বিচার বিবেচনার পর স্থির করিলাম, "রাত্রিটা একভাবে কাটাইয়া দিয়া প্রত্যুষেই ডাক্তারবাবুকে সংবাদ দিব।" কারণ নরেশ একাকী ডাক্তারবাবুর বাড়ী যাইতেও ভয় পায়, রোগীকে লইয়া বসিয়া থাকিতেও ভয় পায়।

কিন্তু সে উষা আর কিছুতেই আসে না! আমাদের এমনি অদৃষ্ট, যাহাকে সাধিতে যাই, সেই অভিমান করিয়া বসে! কি করি? নিরুপায় হইয়া শেষে মানিনীর মান রক্ষা করিতে হয়! তাহাতে অনেক সময় বহু আরাধনার পর আরাধ্যা দেবী প্রসন্না হইতে হইতে, যেমন উষার আলোক আসিয়া উঁকি মারিতে থাকে, সেইরূপ উষা দেবী প্রসন্না হইতে হইতে তাঁহার আলোক আসিয়া উঁকি মারিতে লাগিল। তখনি নরেশ ডাক্তার বাবুর বাড়ী রওনা হইল। আমি তাহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

এদিকে প্রভার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে মায়ের মুখের কাছে যাইয়া "মা, মা" বলিয়া ডাকিতেই তাহার মা বলিয়া উঠিলেন "এই তো, রান্না হইল আর কি!" শুনিয়া প্রভা আবার জিজ্ঞাসা করিল "কি হইল? মা!" তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন "বে-লা শে-ষ হ-ই-য়া-ছে।"

তখন প্রভা আমাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা কি বলিতেছেন?" আমি উত্তর করিলাম, "শরীর নিতান্ত দুর্বল হইলে মনটাও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; তখন আর মানসিক ক্রিয়ার কোন শৃঙ্খলা থাকেনা বলিয়াই ঐরূপ দুই একটা প্রলাপ বাহির হয়; তরুণ জ্বরের বেগেও অনেকের ঐরূপ হইয়া থাকে। উহাতে বিশেষ কোন চিন্তার কারণ নাই। নরেশ ডাক্তারবাবুকে আনিতেই গিয়াছে; তিনি সকালেই আসিয়া পৌঁছিবেন।"

প্রভা কোন কথা বলিল না বটে; কিন্তু এ পরিবর্ত্তনটা যে ভালর দিকে হয় নাই, তাহা সে বুঝিয়া নিল এবং [illegible] যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্য একটু অনুতপ্ত হইয়া মাঝে মাঝে

নৈরাশ্যসূচক দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত মাযের তৎকালীন অবস্থাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইতেই নরেশ ডাক্তারবাবু ও রামবাবুকে নিয়া পৌছিল। কিছুকাল পরে বাবাও আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহারা সকলেই রোগীর অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া গোপনে কি যেন পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাহার অর্থ আমাদের নিকট একেবারে অবদ্ধ রহিল না। বেলা ৮টার সময় হইতেই রোগীর মহাশ্বাস উপস্থিত হইল, বেলা ১২টার পূর্ব্বেই তাহার জীবনের অবসান হইল। আমি আদ্যন্ত লক্ষ্য করিয়াও ব্যাপারটা যে কি হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

তখন প্রভা আছাড়ি পিছাড়ি খাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপে কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। শোকের, পূর্ণ আবেগের সময় বাধা কি সান্ত্বনা দিতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক ও অনেকের নিকট বিরক্তিজনক বলিয়া তাহাকে কেহই বাধা দিল না; সকলেই তাহার শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া নীরবে সেই শোকোচ্ছ্বাসের সাময়িক বিরতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শোকের প্রথম আবেগটা কাটিয়া গেলে আমাদের সকল চেষ্টা সকল যত্ন ব্যর্থ হইল বলিয়া সকলের মনেই বড় আক্ষেপ উপস্থিত হইল। জীবন মরণ মানবশক্তির অতীত জানিয়াও মন তাহা বুঝিতে চায় না; সে ভাবে "এরূপ না করিয়া ঐরূপ করিলে বোধ হয় ভাল হইত।" যে আশায় সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা অপূর্ণ [illegible] থাকিলেই সংশয় জন্মে, বুঝিবা আমার ভ্রম হইল; বুঝিবা আমার [illegible] এই অনর্থ ঘটিল। তাই শেষে নানা আক্ষেপবাণীর উৎপত্তি

হয়। আমাদেরও তাহাই হইল। কেবলি মনে হইতে লাগিল, কেন আমরা রাত্রিতেই ডাক্তারবাবুকে সংবাদ দিলাম না; কেন আমরা অবোধের ন্যায় বসিয়া রহিলাম।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে বাবা আমাকে ও নরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা আর অপেক্ষা না করিয়া বাড়ী চলিয়া যাও; এখন শেষকর্ত্তব্যে তোমাদের কোন অধিকার নাই; — উহার যাহা কিছু আমরাই সম্পাদন করিব।"

আমরা পূর্ব্বেই অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্যও ছিল না; সুতরাং আর কোন কথা না বলিয়া দু'জনেই, যে যার মনে বাড়ীর দিকে চলিলাম। কেন যেন সেখানে আর অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল না;—কেমন যেন একটা ঔদাসীন্য আসিয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিলাম, "এ সব ব্যাপারে মনুষ্যের কি কোনই ক্ষমতা নাই? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে পরের সাহায্যার্থে আমরা যাহাই করি না কেন, তাহার মূল্য অতি কম।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী যাইয়া পৌঁছিলাম। মা আসিয়া সংবাদ শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে প্রভার মা'র কি ভাবে কিরূপে দেহত্যাগ হইল, প্রভাই বা কিরূপ করিতেছে ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেক সময় বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন "সুরেশ! তুই আর কোন রোগীকে দেখিতে যাস্ না, আর ওসব চিন্তাও করিস না। সারা রাত্রি ঘুম না হওয়ায় তোর চোখ বসিয়া গিয়াছে; যা, এখন স্নানাহার করিয়া একটু ঘুমাইয়া থাক্।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্নান করিয়া আসিলাম এবং আহা-

রাত্রে শুইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু নিদ্রা হইল না। ভাবিতে লাগিলাম "মৃত্যুটা কি? লোকে বলে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। যাহা দেখিলাম তাহাতে সেইরূপই ধারণা হইল। কিন্তু সে প্রাণবায়ুটাই বা কি? আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যে বায়ুটা অন্তর্গত বহির্গত হয়, উহাই কি প্রাণবায়ু? যদি তাহাই না হইবে, তবে উদ্বন্ধনে কি নিমজ্জনে লোকের মৃত্যু হয় কেন? আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বায়ুমণ্ডলের একমাত্র অধিকারী বিশ্বরূপ ভগবান্ ভিন্ন প্রাণিপদ-বাচ্য আর কিছুই নাই, আমরা সকলেই প্রাণহীন জড়যন্ত্র—ভগবানের ক্রীড়ার সামগ্রী; এবং এই শরীর যন্ত্রের প্রকৃতিই আমাদের জীবন, আর উহার বিকৃতিই মরণ। আর 'আমি' বলিতেই বা কাহাকে বুঝি? সে কি বায়ুসংযোগে শারীরিক ক্রিয়াটা মাত্র, না তাহার পৃথক অস্তিত্ব আছে? জড়যন্ত্রের ক্রিয়াটাকেই যদি 'আমি' বলি, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, চিন্তা কি অনুভব শক্তিই বা কোথা হইতে আইসে? জড়যন্ত্রের যখন এ সব শক্তি থাকিতে পারে না, তখন যে আমি পদবাচ্য, অবশ্যই তাহার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাকেই এই শরীর যন্ত্রের যন্ত্রী বা আত্মা বলিতে হইবে। সে আত্মাই বা কোথা হইতে কি ভাবে আইসে? এবং মৃত্যুর পরেই বা কোথায় কি ভাবে চলিয়া যায়? আর তাহার স্বরূপটাই বা কি? ইত্যাদি প্রশ্ন এক এক করিয়া মনে উপস্থিত হইতে লাগিল এবং তাহার কোনরূপ সমাধান করিতে না পারায় একটা অতৃপ্তি আসিয়া আমার বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থাটার সূচনা করিল এবং সেই হইতেই আমি একটু ধীর, গম্ভীর ও চিন্তাশীল হইয়া উঠিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

দুর্গাপূজা আসিতে অল্পদিনই বাকি। মা আসিতেছেন বলিয়া সর্ব্বত্রই একটা আনন্দের স্রোত বহিয়াছে,—সর্ব্বত্রই যেন একটা "সাজ, সাজ" রব পড়িয়া গিয়াছে; সকলেই নূতন কাপড়, নূতন পোষাক, নূতন গয়নার অর্ডার দিতেছে। যাহাদের বাড়ী পূজা আছে, তাহাদের ঘর দরজা পর্য্যন্ত সাজান হইতেছে,—পথঘাট পরিষ্কার করা হইতেছে।

আমাদের বাড়ীতেও পূজা ছিল। তজ্জন্য সকলেই কাজকর্ম্মে ব্যস্ত। ঝি, রাধার তো কথাই নাই; সে একটু কালের জন্যও স্থির নাই। সব কাজকর্ম্মই যেন তাহার; সে নিজে যাহা পারিতেছে, তাহা করিয়া যাইতেছে; যাহা পারিতেছে না, অহার জন্য ডাকা ডাকি, হাঁকা হাঁকি করিয়া বাড়ীশুদ্ধ জাঁকাইয়া তুলিতেছে। চাকর, রামচরণ তাহার সহিত যোগ দিয়া মাঝে মাঝে এমন তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিতেছে যে, দেবী ও মহিষাসুরের রণোন্মাদিনী মূর্ত্তি তাহাদের দেখিয়াই প্রত্যক্ষ হইতেছে। আমার কিন্তু সময় একটুও নাই;— আমাদের প্রিলিমিনারি টেষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; পরীক্ষান্তে স্কুল বন্ধ হইবে। সুতরাং সর্ব্বদাই বই নিয়া পড়িয়া থাকিতে হইতেছে—এ সব কাযকর্ম্ম, আমোদপ্রমোদে ততটা যোগদান করিতে

পারিতেছি না। সে দুঃখটা দূর করিবার জন্য এক আধবার রাধা আসিয়া, "দাদাবাবুর পরীক্ষা কি শেষ হইবে না? তুমি এভাবে পড়িয়া থাকিলে, আমরা সব কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দেই" ইত্যাদি ভূমিকার সহিত পূজার আনন্দের ভাগটা কিছু কিছু দিয়া যাইতেছে। আমি তাহার সব কথার উত্তর পর্য্যন্ত করিবার অবসর পাইতেছি না।

এই অবস্থায় একদিন সন্ধ্যার পরে নিবিষ্টমনে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় রাধা "দাদাবাবু! নূতন বৌ দেখিবে? এই দেখ, বৌদিদিকে সাজাইয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া প্রভাকে নিয়া আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ফিরিয়া চাহিতেই "তুই বড় বেহায়া! যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়া ফেলিস্; আমি তোর সঙ্গে আর কোথাও যাব না" বলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রভা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাধার দিকে চাহিল। রাধা হাসিয়া উত্তর করিল, "আর তোমার কোথাও যাইতে হইবে না।" তখন ক্ষণকালের জন্য তাহারা দু'জনে সস্মিত-কোপদৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি তাকাইয়া রহিল।

আমি অবস্থা দেখিয়া অবাক! বস্তুতই প্রভা নূতন বসনে, নূতন ভূষণে ও নূতন ভঙ্গিমায় প্রায় 'নূতন বধূ' সাজিয়াই উপস্থিত! তাহার এ রূপ তো কখনও দেখি নাই! তাহার মায়ের মৃত্যুর পর হইতে সে আমাদের বাড়ীতেই আছে; প্রায়ই বাড়ীর ভিতরে থাকিয়া মা'র সঙ্গে কাজকর্ম দেখে। বাহিরে বড় যাতায়াত করে না। মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইলে দেখিতাম, তাহার মুখে সর্বদাই যেন একটা [illegible] ছায়া পড়িয়া আছে। "সেই প্রভা যে এই" ইহা [illegible] করিতে পারিলাম না; —কেবল তাহার সেই [illegible] ও [illegible] মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার

বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সৌন্দর্য্যের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে; আপাদমস্তক সমস্ত অঙ্গেই যেন সেই প্লাবনের নূতন তরঙ্গ নূতনভাবে আসিয়া পড়িতেছে; এবং সুন্দর নূতন ভূষণগুলি যেন তাহাতে ডুবিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে।

দেখিতে দেখিতে আমার মনটাও যেন সেই তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল এবং তাহার ঘাত প্রতিঘাতে আমি একটু বিচলিত হইয়া পড়িলাম। যখন প্রভা ধীরপাদবিক্ষেপে আমার কাছে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তখন আমার মোহ ভাঙ্গিল; আমি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রভা! আজ এ সাজে তোমায় কে সাজাইয়া দিয়াছে?"

সে হাসিমুখে উত্তর করিল, "মা নিজ হাতে সাজাইয়া দিয়া তোমাকে এ সব দেখাইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

শুনিয়া যুগপৎ আনন্দ ও ভক্তির এমন একটা উচ্ছ্বাস আসিয়া পড়িল, যে মনে মনে মায়ের চরণে শতসহস্র প্রণিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, "আমি ধন্য, যেহেতু এমন স্নেহময়ী জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর প্রভাও ভাগ্যবতী, যেহেতু এমন মায়ের এমন অসীম স্নেহের অধিকারিণী হইয়া এত অল্প দিনে নিজের মায়ের কথা ভুলিতে পারিয়াছে।"

মা এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে আমাদের প্রতি চাহিয়াছিল। তখন আস্তে আস্তে নিকটে আসিয়া এক এক খানা গহনা ধরিয়া ধরিয়া দেখাইতে লাগিল; আর বলিতে লাগিল, "দেখ তো রাজা-বাবু, কেমন সুন্দর মানাইয়াছে। এমন রাজরাণীর রূপ কি বিনা আভরণে শোভা পায়?" এই বলিতে বলিতে প্রভার মুখখানি চুমিয়া ধরিল।

প্রভা আরক্তিমগণ্ডে আমার হাত ছাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "তোর জ্বালায় আর কোথাও দাঁড়াবার যো নাই; তুই যা! তোর আর কিছু দেখাইতে হইবে না!"

"আর দেখাবার দরকারও নাই! যাহার চোখ আছে, সে নিজেই দেখিয়া নিবে" এই কথা বলিয়া রাধা আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। সে কথার কোন উত্তর না করিয়া প্রভা সলজ্জভাবে বলিল, "তবে আমি এখন আসি।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা এস; ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আজকে তোমাকে যে ভাবে দেখিলাম, চিরদিন যেন এইভাবেই দেখিতে পারি।" আমার এই কথা শুনিয়া প্রভার বিস্ফারিত লোচন-দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। সে আর কোন কথা না বলিয়া বিনম্রবদনে আস্তে আস্তে ফিরিয়া চলিল।

তখন রাধা তাহার হাত ধরিয়া থামাইয়া বলিল, "তুমি এমন আশীর্বাদটা নিয়া চলিলে, আর আমি কি শুধু শুধুই ফিরিব?"

"আর জ্বালাস্ না! তুই এখন আয়; আমি যাহা পাইলাম, তাহাই তোকে সমান অংশে বাটিয়া দিব" এই বলিয়া প্রভা রাধাকে নিয়া প্রস্থান করিল। যতদূর পর্যন্ত দেখা গেল, আমি তাহাদের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলাম।

সে দিনকার পড়াশুনা সেইখানেই বন্ধ করিতে হইল। এক একবার বই খুলিতে যাই; আর প্রভার সেই লাবণ্যময়ী মূর্তি আসিয়া আমার দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া বসে। এইরূপ তিন চারিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবার পরে, সেই মোহিনী মূর্তি যেন আমার পাঠ্য-

পুস্তকেই অঙ্কিত হইয়া গেল এবং বই খুলিয়া আমি তাহারি ধ্যান করিতে লাগিলাম।

কিছুকাল এইভাবে কাটিয়া গেলে আমি আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না;—উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম, আমার একি হইল! প্রভাকে তো আরও কত দেখিয়াছি! তাহাতে তো আমি এত চঞ্চল হইয়া পড়ি নাই! এই সাত মাস সে আমাদের বাড়ীতেই আছে; ইহার মধ্যে অনেক সময় তাহাকে সম্মুখে রাখিয়াও তো কাজ করিয়া গিয়াছি! আজ কিনা তাহাকে মনশ্চক্ষুর আড়াল করিতে না পারিয়া পরীক্ষার পড়া বন্ধ করিয়া উঠিতে হইল!

কেন যে এমন হইল, সে কথা তখন আর উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম; পরে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে চলিলাম। সোজাসুজি মায়ের ঘরে যাইয়া দেখি, তিনি প্রভার গয়নাগুলি খুলিয়া রাখিতেছেন। তখন হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম "না— না! মা! ও গয়নাগুলি খুলিও না! উহাতে প্রভাকে বড়ই সুন্দর মানাইয়াছে!"

মা উত্তর করিলেন, "সুন্দর মানায় বলিয়াই তো পরাইয়া দিয়াছি এমন সোনার অঙ্গ কি খালি দেখা যায়? এই পূজার দিনে সকলেই নূতন পোষাকে, নূতন গয়নায় সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইবে, আর প্রভা আমার দীন দুঃখিনীর মত তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিবে, ইহা ভাবিতেও প্রাণে ব্যথা লাগে! আমার তো আর মেয়ে নাই! উহাকেই বিবাহ দিয়া মেয়ে বিবাহের সাধটা মিটাইতে হইবে। তাহাতে গয়নার দরকার যখন হবেই, তখন এই পূজার দিনে কেন

আর উঁহাকে খালি গায়ে বাহির হইতে দেই? এই সকল বিবেচনা করিয়াই এখন এই গয়নাগুলি গড়াইয়া দিলাম। ইহার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, তাহা রাখিয়া আর সব তুলিয়া রাখিব।”

মায়ের কথাগুলি প্রথমে বড়ই করুণ, বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইতেছিল; কিন্তু মাঝখানে কেমন যেন একটা খট্‌কা বাধিয়া গেল,—কথাগুলি যেন ভাল করিয়া বুঝিলাম না: কি যেন অস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইয়া ভবিষ্যতের একটা অন্ধকারময় ছায়া অঙ্কিত করিল এবং আমি যেন তাহার দর্শনভয়েই ভীত হইয়া, মায়ের ঘর হইতে নিজের ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। আবার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়িল,—সেই অকূল সাগর যেন অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ফলে কিছুকালের জন্য আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম। শেষে সেই উন্মুক্ত পাঠ্য পুস্তকের দিকে দৃষ্টি পড়ায় আবার কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন “ওসব ভাবনা আর ভাবিব না” মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলাম।

দুই দিন পরেই আমাদের পরীক্ষা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলও বন্ধ হইয়া গেল। তখন উৎসাহের সহিত পূজার কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলাম। স্বহস্তে প্রতিমা, চণ্ডীমণ্ডপ, আটচালাপ্রভৃতি নরেশকে সঙ্গে নিয়া আমি নিজেই সাজাইলাম। কত লোক দেখিতে আসিয়া আমাদের শিল্পকুশলতার প্রশংসা করিতে লাগিল।—আমরাও মনে মনে যে একটু আত্মপ্রশংসা না করিলাম, তাহা নয়। তথাপি সাধ্য ধরিতে পারিলাম না। যাহাকে সুন্দর করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়, সে যেন কিছুতেই সর্ব্বাংশে সুন্দর হইতে চাহে না; তাহাকে যতই সজ্জিত করা যায়, ততই ত্রুটি বাহির হইতেই থাকে। এ ...

বিপদবিশেষ ; জানিনা এরূপ বিপদে আপনারা কোন দিন পড়িয়াছেন কিনা ; পড়িলে বুঝিতে পারিতেন , "অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া জগতে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন চলিয়া আসিতেছে কেন ? "

যাহা হউক , অধিবাসের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত শতবার পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া যখন দেখিলাম , আমাদের সাজানটা তথাপি সম্পূর্ণ মনোজ্ঞ হয় নাই , তখন সময়াভাবে বাধ্য হইয়া বিরত হইলাম এবং রাত্রে আহারান্তে আমাদের কারুকার্য্যের প্রতি দত্তদৃষ্টি হইয়া অবশিষ্ট ত্রুটিগুলির পর্য্যালোচনা করিতে করিতেই রাত্রিটা প্রভাত হইয়া গেল ।

তখন আমাদের সেই অনুপপত্তি সারিবার জন্যই যেন বাদ্যকর , বাদ্যশিক্ষার সেই কাঁশি , ঢাক , ঢোল এমন কি নাগরা , টিকারা পর্য্যন্ত নিয়া উপস্থিত হইয়া মঙ্গলবাজনা বাজাইতে আরম্ভ করিল । আমরা তাহাতে আপ্যায়িত হইয়া , উঠিয়া উৎফুল্লমনে পুষ্পচয়নার্থ বহির্গত হইলাম । যথাশক্তি পুষ্পসংগ্রহ করিয়া সপ্তমী , অষ্টমী ও নবমী পূজার এই তিন দিন মায়ের প্রসাদ নিবার জন্য আমরা সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলাম । বৈকালে পুরোহিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য চণ্ডীপদ্ধতি গামছায় জড়াইয়া মায়ের উদ্বোধনার্থ সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অধিবাসের জিনিষপত্র যোগাড় হইতে হইতে সন্ধ্যাও আসিয়া উপস্থিত হইল । তখন উলুধ্বনি ও বাদ্যবাজনার সহিত যথাবিধি বোধনাধিবাস সম্পন্ন হইয়া গেল ।

সপ্তমী ও অষ্টমীপূজার দু'দিনে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই । নবমীপূজার দিন সকালেই পূজা বলিদান প্রভৃতি হইয়া গেল । ব্রাহ্মণভোজনান্তে সম্পূর্ণ অবসর প্রাপ্ত হইয়া আমি ও আমার সেবা-

প্রথমে যাইয়া সকলের সহিত সমবেত হইলাম। কিছুকাল পরে যথা-নিয়মে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শোভাযাত্রায় বাহির হইলাম এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া দরিদ্রভাণ্ডারের চাঁদা আদায় করিতে লাগিলাম।

অন্যান্য সব বাড়ী ঘুরিয়া যখন আমরা আমাদের বাড়ী উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; বাহির বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ, আটচালাপ্রভৃতি আলোয় আলোয় ঝক্ মক্ করিতেছে আমাদের বাড়ীর ও পাড়ার অনেক স্ত্রীপুরুষ প্রতিমা ও আরতি দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—স্ত্রীলোক সব চণ্ডীমণ্ডপে এবং পুরুষ সব আটচালায় দাড়াইয়া মায়ের আরতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

আরতি শেষ হইয়া গেলে আমরা আটচালায় উঠিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলাম এবং সকলেই আমাদের দিকে ফিরিয়া তাহা শুনিতে লাগিল। তখন একটা গম্ভীর ভক্তিরসের সঞ্চার হওয়ায় সমবেত জনমণ্ডলী সম্পূর্ণ নীরব হইয়া রহিল, অনেকে আবেগভরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আমাদের মধ্যে সকলেই তখন সঙ্গীতে মত্ত। তাঁহাদের এ সব লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল কিনা জানি না; কিন্তু ঘটনাক্রমে আমাকে সবি লক্ষ্য করিতে হইল।

সমবেত স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়াই আমার প্রভার কথা মনে পড়িল। অনুসন্ধানে দেখিলাম, মায়ের পাশেই চিত্রাপিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া প্রভা আমাদের প্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া আছে। পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার পরে সে যে রূপলাবণ্য নিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় তাহার গৌরব যেন আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু আজ আর সে হাসি, সে প্রফুল্লতা নাই; আজ-

দের দর্শনে তাহার যেন কোন পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়াছে এবং সমস্ত প্রাণটা যেন উদাসদৃষ্টিতে বহির্গত হইয়া তাহার অনুধাবন করিতেছে; আর রুদ্ধসন্তাপে অন্তরের কোমল বৃত্তিগুলি যেন তরল হইয়া মুক্তাফলের ন্যায় নয়নযুগল দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। সে দৃশ্য আমার মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত হইয়া গেল এবং ইচ্ছা হইতে লাগিল যে দ্রবীভূত সমস্ত প্রাণটা ঢালিয়া দিয়া তাহার সেই শোকসন্তাপ নিবারণ করি।

এমন সময় হঠাৎ প্রভার দিকে দৃষ্টি পড়ায়, মা তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ মা! তুই কাঁদিতেছিস! আজ এমন দিনে কি চক্ষুর জল ফেলিতে আছে? ছি ছি! অমন কাজ করিতে নাই!" এই বলিতে বলিতে তিনি নিজের অঞ্চলে প্রভার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন। প্রভা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে সরিয়া দাঁড়াইল।

প্রভা চক্ষুর অন্তরাল হইলে অন্যান্য সকলের প্রতি দৃষ্টি পড়িল - দেখিলাম "অনেকের চক্ষুই অশ্রুভারাক্রান্ত; কিন্তু তাহাতে আবেগ আছে,— উচ্ছ্বাস নাই; মোহ আছে, —তন্ময়তা নাই, আন্তরিকতা আছে,—গভীরতা নাই। সুতরাং তাহা দেখিয়া প্রভার:স্নে ভাব আর বিস্মৃত হইতে পারিলাম না। যতক্ষণ না আমাদের বাড়ী পরিত্যাগ করিলাম, ততক্ষণ তাহার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। জীবনে এক বার নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হইলে, ভবিষ্যতের শত সুখও সেই শোকের স্মারক হইয়া দাঁড়ায় এবং সকল উৎসবেই সুখ দুঃখ মিশ্রিত হইয়া দুঃখের অংশটা প্রবল হইয়া পড়ে।"

সংকীর্ত্তন শেষ হইয়া গেলে বাবা আমাদের বার্ষিক চাঁদা ১৲ এক

টাকা দিয়া দিলেন এবং আমাদের দলের সকলে জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলেন, আমিও তাহাদের সঙ্গে আবার সংকীর্ত্তন গাহিতে করিতে বাহির হইলাম। এইভাবে রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি। শেষে নরেশের [illegible] ফিরিলাম। কয়দিনের পরিশ্রমে শরীরটা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই আহারান্তে শুইয়া পড়িতেই আমরা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

পরের দিন সকালে আর ঘুম ভাঙ্গিতেই চায় না। [illegible] ভ বাহির করিবার জন্য অনেকে গলাগলি [illegible] বাঙ্গালীদের মধুর শানাই টীকারা নিয়া প্রভাতী সঙ্গীত [illegible] দিল, তখন মায়ের কোলে নিদ্রিত সন্তান যেমন একটু একটু করিয়া স্তন্য পান করিতে থাকে, অথচ নিদ্রাবেশ দূর হয় না আমরাও সেইরূপ একটু একটু করিয়া সেই সঙ্গীতের রস আস্বাদন করিতে লাগিলাম, কিন্তু নিদ্রালসতা দূর হইল না। তখন কে যেন আসিয়া গাহিয়া উঠিল :— (মোরা) কারে পূজা করি ?

এ কি সেই মহাশক্তি দুর্গামূর্ত্তি,
দানবদলনী সুরী ?

যে শক্তি পদতলে দলিয়ে দৈত্যকুলে
শাসিত বাহুবলে যত অত্যাচারী,
রক্ষিত দশদিকে দশভুজ বিস্তারি—
তারে কি পূজি মোরা বুঝিয়ে বুঝিতে নারি ॥

যে দেবী সর্ব্বভূতে বিরাজে শক্তিরূপে
তার উদ্বোধন এরূপে ঘটের উপর করি,

শুধু 'নমস্তস্যৈ' ব'লে তারি পূজা সারি—
বলি দিয়ে পাঁঠা মহিষ আত্মবলি যাই পাসরি॥

যে দেবী সিংহের পরে দাঁড়ায়ে অস্ত্র ধ'রে
হুঙ্কারে ভস্ম করে কত শত অরি;
মোরা কি তারে ভজি? সে রূপ নেহারি?
পৌত্তলিক এরেই বলে; দেনা রে এ পূজা ছাড়ি॥

গানটী শুনিয়াই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কে গাহিতেছে দেখিবার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া গায়কের প্রতি বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে চাহিয়া রহিলাম। গায়ক একজন উদাসীন-বেশধারী বহুরূপী, না প্রকৃতই উদাসীন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বয়সে প্রৌঢ় হইলেও যুবার ন্যায় তাঁহার রূপলাবণ্য রহিয়াছে এবং সর্ব্বশরীর হইতে যেন এক দিব্য জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে; তাঁহার সুদীর্ঘ আয়তন, বলিষ্ঠ গঠন এবং তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক দৃষ্টির মধ্য দিয়াও যেন একটা উদ্দীপনার ভাব প্রকটিত হইতেছে। তাঁহার সেই তেজোময়ী মূর্ত্তি দেখিলে, তাঁহার নিকট সকলেরই মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা হয়।

আমি অনুনয়ে তাঁহাকে বসিতে বলিলাম; কিন্তু তিনি বসিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বহুরূপী?" তিনি উত্তর করিলেন, "শুধু আমি কেন, এ জগতের সকলেই বহুরূপী।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের দেশ কোথা?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "উদাসীনের আবার দেশ বিদেশ কি? এই জগতই আমার দেশ।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়?

অনুগ্রহ করিয়া আপনার নামটা বলিবেন কি?" তিনি প্রবোধ দিলেন, "বহুরূপীর পরিচয়ের জন্য আপনি এখনই এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন?" "আপনি যে সে বহুরূপী নন, আমার ধারণায় কোন মহাপুরুষ হইবেন, তাই আমার একটু কৌতূহল হইতেছে" বলিয়া আমি তাঁহার দিকে চাহিতেই, "সময়ে আমার পরিচয় পাইবেন" বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি প্রস্থান করিলেন।

তখন নরেশ বলিয়া উঠিল, "আহা! ছাড়িয়া দিলে যে? সময় থাকিতে আর দু'চারটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রাখ! না হইলে তোমার মহাপুরুষ তো অন্তর্হিত হইলেন!"

আমি তাহাতে একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "দেখ নরেশ! সব বিষয় নিয়া রহস্য করিতে নাই। তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ।"

সে উত্তর করিল, "হাঁ, আমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু 'ছেলে হইয়াছে মানুষ যার' এই বহুব্রীহি সমাসার্থে, আর তুমি মেয়েমানুষ বহুরূপীটাকে দেখিয়াই ভুলিয়া গেলে? এখন যাও, ওর পাছে পাছে না যাইয়া বসিয়া আছ কেন?"

আমি বলিলাম, "এটা নিশ্চিত জানিবে যে এ মেয়েমানুষ, তোমার মত ছেলেমানুষ তো দূরের কথা, অনেক পুরুষ মানুষের চেয়েও ঢের বেশী চিনিতে পারে, আর এমন পুরুষও বড় দেখি না যে ঐ মহাপুরুষের কাছে মেয়েমানুষ না হইয়া পারে।"

নরেশ কহিল, "মেয়ে মানুষই যদি হও, তাহা হইলে ঐ ভণ্ড—টার নিকট না হইয়া যদি আমাদের নিকট হইতে, তবে লভটা আর রিনিউড্ করিয়া নিতে হইত না। অসভ্যটা একটাও সত্য কথা বলিল না!"

এবার বস্তুতই আমার একটু ক্রোধ হইল। বলিলাম, "দেখ, নরেশ! আমার মত মেয়ে পাইতে হইলে, আগে মানুষ হইতে হইবে। ভণ্ডই বা কারে বলে, তুমি জান? জানিলে আর ঐ মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে হঠাৎ ভণ্ড, অসভ্য বলিয়া গালাগালি দিতে যাইতে না! ঐ মহাপুরুষ যদি ভণ্ড হন, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে ছিন্‌ছিয়ার কেহ নাই;—উনিই যদি অসভ্য হন, তাহা হইলে জগতে কেহ সভ্য নাই;— আর উঁহার কথাই যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে এ ভারতে আর সত্য কথা নাই।

আমার ভাব দেখিয়া নরেশ একটু থামিয়া গেল। পরে মীমাংসা-চ্ছলে বলিল, "অলং বিবাদেন! কালকেই বুঝা যাইবে; আজ যিনি এত আগ্রহ করায়ও বসিলেন না, কাল তিনি স্বাগ্রহে আসিয়া তদীয় আসন গ্রহণ করিবেন এবং আত্মপরিচয়, জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে, আপনিই দিয়া যাহাতে দু'পয়সা বেশী পান তাহার চেষ্টা করিবেন।

তখন আমার মেজাজটা একটু নরম হইলেও আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝিতেছ; উঁহাকে কাল আর দেখি-তেই পাইবে না।"

নরেশ চোক ঘুরাইয়া ব্যঙ্গ করিল, "তোমাকে তো দেখিতে পাইব? এটা বোধ হয় আর ভুল করিতেছি না?"

আমি প্রশ্ন ধরিলাম, "আজ তো দেখিতেই পাইতেছ; কিন্তু কাল যে দেখিতে পাইবে তাহার নিশ্চয়তা কি আছে?"

নরেশ সেই ভাবেই উত্তর করিল, "না—না! তোমার বিরহ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না! তোমাকে না দেখিলে যে পাগল হইয়া যাইব!"

"যদি তাহাই হয়, তবে আজ না হয় কাল তোমাকে পাগল হইতেই হইবে" আমি এই কথা বলিতেই, "আজ দশমীর দিনে তোমরা কি ঝগড়া আরম্ভ করিলে? এ সব কথা বলিতে নাই! সময়ানুসারে মুখের কথা সত্যও হইয়া যাইতে পারে" বলিয়া বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দিতে বসিলেন।

অমনি নরেশ বলিয়া উঠিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনি তো একজন ভাল জ্যোতিষী! আমার হাতটা একটু দেখুন না,—আমার অদৃষ্টে কোন দিন বিরহ আছে কি না?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমে অস্বীকার করিলেন, "না, আমি এখন হাত দেখিতে চাহি না।"

নরেশ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল, "না, না! আমি উপহাস করিতেছি না! সকলেই বলে আপনি করকোষ্ঠী খুব ভালই গণনা করেন; তাই অনেক দিন হইতেই আপনাকে হাত দেখাই-বার কথা মনে করিয়া আসিতেছি। আজ যখন আপনাকে অবসর-প্রাপ্ত দেখিতেছি, তখন আমার হাতটা দেখিতেই হইবে।"

এ বিষয় আমারও একটু কৌতূহল উপস্থিত হইল। বলিলাম "হাঁ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! দেখুন না, ওর হাতটা; ও অনেক দিন হইতেই আপনাকে হাত দেখাইবার কথা বলিতেছে।"

তখন "আপনার পায়ে পড়ি; একবার দেখুন না, আমার অদৃষ্টে কি আছে।" এই বলিয়া নরেশ তাহার হাতখানা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সামনে বাড়াইয়া দিল। তিনি আমাদের আগ্রহাতিশয্যে ধীরে ধীরে হাতখানা ধরিয়া টিপিয়া টিপিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। আমরাও গণনার ফলাফল শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছুক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি জানিতে চাও? নরেশ!"

নরেশের সেই পূর্ব্বের কথা মনে পড়িতেই বলিল, "আগে সেই বিবাহ এবং বিরহটার বিষয় কি দেখিতেছেন, তাহাই বলুন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া কহিলেন, "বিবাহ! — ও বিষয়টায় একটু গোলযোগ আছে। আর বিরহটা বিবাহের পূর্ব্বেই কিছু বেশী দেখিতেছি।

আমি হাসিয়া পড়িলাম। বলিলাম, "হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন, ও যখন আমাকেই বিবাহ করিতে চায়, তখন ওর বিবাহের বিষয় নিশ্চয়ই গোলযোগ আছে। আর বিরহ ত পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছে।"

নরেশ তো ইহা শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটু অভিমান হইল; তিনি "ছেলেমানুষের হাত দেখিতে নাই, বিশেষতঃ আজ দশমীর দিনে গুরু পুরোহিতের মুখ দিয়া কোন কথাই বলিতে নাই" এই বলিয়া নরেশের হাত ছাড়িয়া দিলেন এবং শত অনুরোধ করায়ও আর হাত ধরিলেন না।

তখন রাধা আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু! তোমাকে এবং নরেশ-বাবুকে মা ডাকিতেছেন, তোমরা যাও, তাঁহার কথা শুনিয়া আইস।"

রাধার কথা শুনিয়া আমরা দু'জনেই বাড়ীর ভিতরে মার কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "বেলা হইয়াছে; যা, তোরা এখন সকাল সকাল স্নান করিয়া আসিয়া চাট্টি খা। কালকার খাবার জিনিষ সব আছে; বেশী বেলা হইলে সে গুলি নষ্ট হইয়া যাইবে।"

আমরা আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া স্নান করিয়া আসিলাম এবং আহারান্তে এমনি ঘুম দিলাম যে সন্ধ্যার সময় প্রতিমা-বিসর্জ্জনে যাইবার জন্য বাবা আসিয়া আমাদের ডাকিয়া তুলিলেন। উঠিয়া আমি ও নরেশ দু'জনেই কাপড়চোপড় পরিয়া ভাসানে চলিলাম। গঙ্গায় যাইয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবার পরে সকলেই আবার বাড়ীর দিকে ফিরিল; কেবল আমি আর নরেশ তীরে বসিয়া গঙ্গার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমাদের নয়নমন মুগ্ধ হইয়া গেল; আমরা বাড়ী ফিরিবার কথা ভুলিয়া গিয়া গঙ্গাপারেই বসিয়া রহিলাম।

গঙ্গার সে সৌন্দর্য্য আমাদের পক্ষে অনুভূতির বিষয়, বর্ণনার বিষয় নহে। তাহা বর্ণনা করিতে পারি, আমার এরূপ কবিত্ব নাই। থাকিলে, তাহার স্রোত, সেই শাস্তোজ্জ্বল শারদী কৌমুদীর সহিত তরঙ্গায়িত গঙ্গার স্রোতের ন্যায়, দেশ দেশান্তর প্লাবিত করিয়া অনন্তসাগরে—না! না! অনন্ত কবিত্বের আধার সেই অনন্তদেবে যাইয়া বিলীন হইত;—তাহার সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া কতলোক তন্ময় হইয়া যাইত;—তাহাতে অবগাহন করিয়া কত পাপী তাপীর প্রাণ মন শীতল হইত;—তাহাতে ডুবিয়া কত পাষাণ গলিয়া যাইত; আর তাহাতে ভাসিয়া কত পথভ্রান্ত গন্তব্য স্থানে যাইয়া উপনীত হইত। কিন্তু সে শক্তি আমার নাই; তাই হৃদয়রূপ ফটোকার্ডে অঙ্কিত সেই দৃশ্যের নেগেটিভ্‌টা মাত্র দেখাইলাম। এখন আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া পজিটিভ্‌টা বাহির করিয়া লইবেন; ইচ্ছা হইলে তাহার ব্রোমাইড্ এন্‌লার্জমেণ্টও করিয়া নিতে পারেন।

কিছুক্ষণ পরে নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই! তোমাদের পুরোহিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাকি জ্যোতিষ-শাস্ত্র ভালই জানেন? অথচ আমার হাত ধরিয়া অত রকম করিয়া দেখিয়া শুনিয়াও শেষে কি মাথ মুণ্ড বলিলেন, তাহার কিছুই বুঝিলাম না।"

আমি উত্তর করিলাম 'তুমি বুঝিবে কি? আজকাল একটু রোম্যান্স না হইলে নব্যশিক্ষায়শিক্ষিত যুবকযুবতীদের পক্ষে বিবাহটা নিতান্ত নীরস হইয়া পড়ে। পিতা মাতা দেখিয়া শুনিয়া কোন সম্বন্ধ করিতে গেলে, তাহাতে মন উঠে না,— নিজেরাই সম্বন্ধ বাছিয়া নিতে যান; অথচ একটা কুটিল কটাক্ষ, একখানা ফটোর ভঙ্গিমা বা একটা গানের মূর্চ্ছনায় মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ 'লভ'এ পড়িয়া যান এবং বিবাহের পূর্ব্বেই প্রায়শ বিরহটা আসিয়া পড়ে। পরে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধানুসারে যদি কাহারো ভাগ্যে মিলন ঘটে তখন তাহার রূপ, না গুণ, না আর কি দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন, তাহা নিজেরাই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় বিবাহে গোলযোগ কি মিলনের পূর্ব্বেই বিরহটা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

শুনিয়া নরেশ একটু অপ্রতিভ হইল এবং সেই ভাবটা চাপা দিবার জন্যই বলিয়া উঠিল 'সাবস্ট্যান্‌স্ এক্সপ্লানেসন্ কি এমপ্লিফিকেসন্' এ অন্য কেহ না দিলেও, আমিই তোমাকে ফুল মার্ক দিব এখন চল, বাড়ী যাওয়া যাক; না হইলে আমাদের অনুসন্ধানে আবার লোক আসিবে।

"হাঁ, বিবাহ বিরহ ইত্যাদি নিয়া তোমার মস্তিষ্কটা একটু গরম

হইয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি ; চল শান্তির জল নিয়া মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া নাও" আমি এই কথা বলিতে বলিতেই দেখি রামচরণ আসিয়া হাজির। কি খবর জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "কর্ত্তাবাবু শান্তির জল দিবার জন্য ডাকাডাকি করিয়া আপনাদের না পাইয়া শেষে আমাকে অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছেন।"

আমরা আর অপেক্ষা না করিয়া বাড়ীর দিকে চলিলাম। বাড়ী যাইয়া শান্তির জল গ্রহণান্তে সকল গুরুজনকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম ; পরে আহারান্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নিয়া [illegible] বাড়ী যাইয়া বসিলাম।

তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া উঠিলেন "পূজা—পূজা—পূজা ; সেই এবারকার মত মায়ের পূজা শেষ হইয়া গেল।

শুনিয়া "এখনও আমাদের ভ্রম ঘুচিল না ! এখনও আমরা মনে করি, মায়ের পূজা যথাবিধি সম্পন্ন হইতেছে ; আমরা যাহা করি, সে কি পূজা ? সে শুধু ছেলেখেলা মাত্র। মাতৃমূর্ত্তির পূজা বহুদিন পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছে" এই কথা বলিতে বলিতে আমি গান ধরিলাম "মোরা কারে পূজা করি ?" ইত্যাদি। [illegible]

নরেশ এবার গানটা নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল "এই গানটাই না সন্ধ্যাবেলার সেই বহুরূপী গাহিয়া গিয়াছে ?"

আমি উত্তর করিলাম "হাঁ, এই গানটাই ; কেন, তুমি তখন শোন নাই ? [illegible]

নরেশ স্বীকার করিল "একটু একটু শুনিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু তখন ঘুমের ঘোরে উহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। গানটা কেমন [illegible] ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমর্থন করিলেন "হাঁ, গানটায় একটু আধ্যাত্মিক ভাবও আছে, বোধ হয় গানটা কোন সাত্ত্বিক লোকের রচিত হইবে।"

শুনিয়া নরেশ বলিল "আধ্যাত্মিক ভাবটাব বুঝিনা, সেই বহুরূপীটাকে জানিতে হইবে।"

"তাহাকে পাইলে তো জানিবে" আমি এই কথা উচ্চারণ করিতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিষেধ করিলেন "এখন আবার সকালকার মত ঝগড়া বাধাইও না। পাও, না পাও কালকেই বুঝা যাইবে! এখন শুইয়া ঘুমাও।" আমরা আর গোলমাল না করিয়া শুইয়া পড়িলাম, তিনি ও শুইয়া পড়িলেন।

পরের দিন সে বহুরূপী আর ফিরিল না, অনেক অনুসন্ধানে তাহার কোন খোঁজও করিতে পারিলাম না। তখন নরেশকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, আমার অনুমান ঠিকও হইতে পারে এবং তাহার ওজাতীয় তর্কবিতর্কটা ঠিক সঙ্গত হয় নাই।

সে দিন আমাদের এখানে থাকিয়া পরের দিন সকালে নরেশ বাড়ী চলিয়া গেল। পরীক্ষা সমীপবর্ত্তী মনে করিয়া আমিও সঙ্কল্প করিলাম "আর বাজে বিষয়ে মন না দিয়া এখন হইতেই রীতিমত পড়াশুনা করিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—ঃ*ঃ—

পরীক্ষার পূর্ব্বের কটা মাস আজ কাল করিতে করিতেই কাটিয়া গেল। পাঠ্যাদি যতদূর প্রস্তুত করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, ততদূর আর করিয়া উঠিতে পারিলাম না। টেষ্ট পরীক্ষায় আমি ও নরেশ উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতাকেন্দ্রে আবেদন করিলাম এবং ফাইনাল পরীক্ষার পূর্ব্বপর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকিয়াই পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। এ সময় প্রভা বুঝিয়া শুনিয়াই বড় নিকটে আসিত না; আমিও না আসাই মঙ্গল মনে করিতাম।

'প্রেসিডেন্‌সি কলেজ'এ আমাদের সিট্ পড়িয়াছিল। নরেশের ভগিনীপতি শ্যামবাজারের নিকটে থাকিতেন। ইচ্ছা হইলে সে তাঁহার বাসায় থাকিয়া পরীক্ষা দিতে পারিত; কিন্তু শ্যামবাজার হইতে প্রেসিডেন্‌সি কলেজ যেমন একটু দূর, তেমন দু'জনে একস্থানে থাকিতে পারিলে পড়াশুনার পক্ষে একটু সুবিধা হয়, মনে করিয়া নরেশ আমার সঙ্গে মিলিয়া মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে একটা বোর্ডিং ঠিক করিল এবং ফাইনাল্ আরম্ভ হইবার দুই দিন পূর্ব্বে আমরা যাইয়া কলিকাতায় পৌছিলাম। পরীক্ষার কটা দিন একরূপ কাটিয়া গেল। আমাদের লেখা টেকাও মন্দ হইল না; পরে আরও কয়েকটা দিন কলিকাতায় থাকিয়া সব দেখিয়া শুনিয়াই বাড়ী ফিরিব স্থির করিলাম।

আমরা প্রথমদিন আলিপুর জুলোজিকাল্ গার্ডেন্, দ্বিতীয়দিন হাবড়া-ব্রিজ্ ও হাবড়া ষ্টেসন, তৃতীয় দিন পার্শ্বনাথের মন্দির দেখিয়া আসিলাম। চতুর্থদিন সকালে আহারাদি করিয়া মিউজিয়ম দেখিবার জন্য রওনা হইলাম। এসিয়াটিক সোসাইটীর সেই বিস্তীর্ণ ত্রিতল বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রথম একটা ঘরে প্রবেশ করিতেই সেখানে নরেশের ভগিনী ও ভগিনীপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। নরেশের ভগিনীপতি হরেনবাবু তাহার স্ত্রী ও ছেলে ননী, এবং তিনি যে বাড়ীতে ভাড়াটীয়া ভাবে থাকিতেন, সেই বাড়ীর গিন্নী ও তাহার দুটী মেয়েকে নিয়া মিউজিয়ম দেখিতে আসিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ পরস্পর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় কিছুকাল অতিবাহিত হইল। পরে হরেনবাবু আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নরেশ আমার পরিচয় দিলে, তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন "চলুন আমরা আগে যাই; নরেশ উহাদিগকে সব দেখাইয়া শুনাইয়া পিছনে পিছনে আসিতে থাক।"

আমি তাহাই সঙ্গত মনে করিয়া হরেন বাবুর সহিত দৃশ্যগুলি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম; আর নরেশ তাহার ভগিনী প্রভৃতিকে দেখাইয়া শুনাইয়া পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। ননীর বয়স বার তের বৎসর। সে ইংরাজী বিশেষ না জানায় নরেশই ইংরাজী ভাষায় লিখিত লেভেলগুলিদ্বারা প্রত্যেক জিনিষের পরিচয় দিয়া, তাহা সকলকে দেখাইতে লাগিল।

বাড়ীওয়ালী গিন্নীর সহিত যে দু'টী মেয়ে আসিয়াছিল, তাহার বড়টীর বয়স চৌদ্দ বৎসরের কম নয়; ছোটটীর বয়স দশ এগার বৎসর হইবে। দেখিতে তাহারা উভয়েই বেশ সুন্দরী। বড় মেয়েটী আমাদের দেখিয়া

প্রথমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল ; পরে নরেশের পরিচয় পাইয়া তাহার সাহস হয় এবং তাহার সহিত সুপরিচিত হইবার জন্য একটু আগ্রহও জন্মে। আমি এই পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেই হরেনবাবু আমাকে নিয়া আগে আগে চলিলেন।

পরে তাহাদের পরস্পরের ভাব দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে ফিরিয়া চাহিয়া লক্ষ্য করিলাম, বড়মেয়েটী তাহার জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি নরেশের ভগিনীর দ্বারা নরেশের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে এবং অনুসন্ধিৎসু কুটিল কটাক্ষে নরেশের উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে ; আর নরেশ সর্ব্বত্রই দুই একটা প্রশ্নের অপেক্ষায় মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসু বঙ্কিম নয়নে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে।

দৃশ্যটী মন্দ নয়। উহাতে আমার বেশ একটু কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইল। নূতন যৌবনোদ্গমে মেয়েটীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে ; তাহাতে তাহার মত চঞ্চল নয়নের সরল ও কুটিল দৃষ্টি পর্য্যায়ক্রমে ক্ষিপ্রগতিতে একবার মিউজিয়মের এক একটী দৃশ্যবস্তুর উপরে আবার নরেশের উপরে পতিত হইতেছে ; নরেশ তাহার সহিত সমান গতিতে একবার সেই দৃশ্যবস্তু ও অন্যবার মেয়েটীর দিকে চাহিতেছে, আবার সেই মেয়েটীর প্রতি তদ্রূপ সরল ও কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দৃশ্যবস্তুগুলির পরিচয় দিয়া যাইতেছে। পরিচয়ের এমন সুন্দর সুত্র অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে। তাই এক্ষেত্রে নরেশকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলাম।

মিউজিয়মের সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখিয়া শেষ করিতে আমাদের প্রায় ৫ ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল। প্রায় ৬টার সময় আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। তখন হরেন বাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "আর,

শ্বশুর মহাশয়ের পত্রেই জানিয়াছি, আপনারা এখানে পরীক্ষা দিতে আসিয়াছেন, কিন্তু পরীক্ষার সময় আপনাদের সিট কোথায় পড়িয়াছে, তাহা না জানায় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই; আজ যখন দেখা হইয়াছে, তখন আর বোর্ডিংএ যাইতে পারিবেন না। চলুন, এখন আমাদের বাসায় চলুন।

আমি বলিলাম, "আপনার বাসায় যাইতে আমাদের কোনই আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু বোর্ডিংএ বলিয়া আসা হয় নাই, হয়ত আমাদের জন্য পাকশাক করিয়া বসিয়া থাকিবে, বিশেষ আমাদের জিনিষপত্র-গুলি বোর্ডিংএ আলগা পড়িয়া রহিয়াছে।"

হরেনবাবু প্রস্তাব করিলেন "যখন এক গাড়ীতে আমাদের সকলকে ধরিবে না, তখন চলুন আপনি আর আমি ট্রামে যাই, আর নরেশ আর সকলকে নিয়া গাড়ী করিয়া বাসায় যাক; আমরা বোর্ডিংএ বলিয়া, সেখানে জিনিস পত্র যাহা আছে, তাহা লইয়া পরে বাসায় যাইব; তাহাতে সব দিকই রক্ষা পাইবে।

আমি নরেশের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায়, সে আমার উপরেই ভার দিল। তখন হরেনবাবুর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া আমি ও হরেনবাবু ট্রামে রওনা হইলাম; নরেশ আর সকলকে নিয়া গাড়ীতে রওনা হইল।

বড় মেয়েটীর পরিচয় জানিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমার একটু আগ্রহ জন্মিয়া ছিল, কিন্তু এযাবৎ জিজ্ঞাসার অবসর ছিল না। ট্রামে উঠিয়াই আমি হরেন বাবুকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন "মেয়েটীর নাম লীলা; তাহার পিতা চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। নদীয়া জিলায় তাহাদের বাড়ী; চাকরীর খাতিরে তিনি কলিকাতায় বাসা করিয়া আছেন। শ্যামবাজারের

নিকটে উহাঁদের মধ্যেই আমি আবার দু'খানি ঘর নিয়া আছি। উহারা অতি ভদ্রলোক; আমাদের সকলকে নিজ পরিবারের ন্যায়ই মনে করেন। যে গিন্নী আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি চন্দ্রকান্ত-বাবুর স্ত্রী; ঐ মেয়ে দুটী ভিন্ন উঁহাদের আর সন্তান নাই।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "চন্দ্রকান্ত-বাবু এখানে কি কাজ করেন?" হরেনবাবু বলিলেন "তিনি কন-ট্রোলার জেনারালস্ অফিসে এ ৩৫০্ টাকা বেতনের একজন সুপারিন-টেন্‌ডেণ্ট; আমি তাঁর থ্রুতেই ঐ আফিসে কাজ পাইয়াছি।"

পরিচয়টা পাইয়া কথেকটা আশ্বস্ত হইলাম। মনে ভাবিলাম যদি নরেশের আসক্তির মাত্রাটা চড়িয়া যায়, তবে চেষ্টা করিলে, বিবাহের ঘটকালীটাও করিয়া ফেলা যাইতে পারিবে।

সন্ধ্যার পরে আমরা বোর্ডিংএ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের জিনিষপত্র নিয়া যাইতে চাহিলে, বোর্ডিংএর ম্যানেজার তাহার প্রাপ্য টাকা চাহিল। আমি হিসাব করিয়া তাহা দিয়া দিলাম। পরে জিনিষপত্র সমেত হরেনবাবুর সহিত তাঁহাদের বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম।

বাসায় গিয়া দেখি নরেশ সকলকে নিয়া পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছে। তখন কিছুকাল বিশ্রামের পর হরেনবাবু সাগ্রহে বলিলেন "আসুন, সুরেশবাবু! আজ একটু গানবাজনা করা যাক্।" এই বলিয়া তিনি নিজেই হারমোনিয়ম নিয়া বসিলেন; আমি বায়াতবলা ধরিলাম; নরেশ সময় বুঝিয়াই গান ধরিল—

(আমি) সকল যাতনা সহিব নীরবে;
(তুমি) একবার মোরে চাহিও।

(আমি) বিষাদসাগরে ডুবিয়া রহিব,
(তুমি) একবার দেখা হ'লে শুধু হাসিও;
(আমি) চিরকাল হেথা কাঁদিয়া কাটাব,
(তুমি) একবার শুধু শুনিও।
(আমি) নিশিদিন হেথা পড়িয়া রহিব,
(তুমি) বারেক সে কথা ভাবিও।
(আমি) সকল ছাড়িয়া চলিয়া যাইব;
(তুমি) একবার শুধু ডাকিও।
(আমি) হেলায় জীবন দিব বিসর্জ্জন;
(তুমি) একবার ধরে তুলিও।

নরেশ মনে মুখে যেমন গাহিতেছিল, গানটাও তেমনি লাগিল। বাড়ীশুদ্ধ সকলে আসিয়া সমবেত হইল; আবেশে চন্দ্রকান্তবাবুর চোঁকে জল আসিল। কিন্তু চোরের মন বোঁচ্‌কার দিকে;—আমি দেখিলাম, লীলা সতৃষ্ণনয়নে নরেশের দিকে চাহিয়া আছে এবং মুগ্ধ হইয়া তাহার অন্তরের ছবি বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

গানটা শেষ হইতেই চন্দ্রকান্তবাবু আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া আমার হাত হইতে বায়াতবলাটা চাহিয়া নিলেন এবং আমাকে একটা গান করিতে বলিলেন। আমিও একটা গাহিলাম বটে; কিন্তু গানটা সেরূপ খাপ খাইলনা। পরে নরেশ আর একটা গাহিল। এই ভাবে আমাদের নিয়া বেশ মজলিস চলিল। তাহাতে কে কি গান গাহিলাম, বলিতে গেলে ব্রাহ্মসঙ্গীত, শ্যামা-সঙ্গীত, থিয়েটারসঙ্গীত প্রভৃতির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া পড়িবে; সুতরাং সে সব উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। রাত্রি প্রায়

১টার সময় আমাদের মজলিস ভঙ্গ হইল এবং এই প্রসঙ্গে চন্দ্রকান্তবাবুর সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় হইয়া গেল।

হরেনবাবুর বাসায় যে কয়দিন ছিলাম বেশ আমোদ প্রমোদেই কাটাইয়াছিলাম। চন্দ্রকান্তবাবু ও হরেনবাবু যেমন আফিসে বাহির হইতেন; আমরাও তেমন সহরের অবশিষ্ট দৃশ্যগুলি দেখিতে বাহির হইতাম। প্রথম দিন শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন, দ্বিতীয় দিন ইডেন গার্ডেন, তৃতীয় দিন মিউনিসিপাল মার্কেট, এইরূপে প্রতিদিন দেখিয়া শুনিয়া সন্ধ্যার পরে আসিয়া আবার গান বাজনা করিতে বসিতাম।

একদিন সকালেই গামছা কাপড় নিয়া কালীঘাট মায়ের বাড়ী রওনা হইলাম। ৺কালীমাতাকে দর্শন করিয়া পূজান্তে বেলা প্রায় ১টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিয়া নরেশ হরেনবাবুর ঘরে ঢুকিল আমি বৈঠকখানায় ঢুকিতেই দেখি, একটা মাড়োয়ারী ছোকরা আসিয়া পার্শ্বের দরজা দিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তাহার গায়ে পাতলা একটা পাঞ্জাবী! পাতলা কাপড় একখানা মাড়োয়ারী ফ্যাসনেই পড়া; পায়ে জুতা; মাথায় হলদে রং এর একখানা সিল্কের চাদর দিয়া পাগড়ী বাঁধা।

আমাকে দেখিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল; পরে সন্ত্রস্তভাবে একটু এদিক ওদিক করিয়া যখন দেখিল, পাশ কাটাইয়া যাওয়া কঠিন, তখন জিজ্ঞাসা করিল "ননী কাঁহা গিয়া? জী?"

ছেলেটা হরেনবাবুর ঘর হইতে বাহির হওয়ায় প্রথমেই আমার একটু সন্দেহ হইয়াছিল; পরে তাহার কথা শুনিয়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেই আমি তাহাকে চিনিয়া ফেলিলাম এবং

একটু রহস্য করিবার ছলেই বলিলাম, "তুম্ এহাঁ পর বৈঠো ; হাম্ বোলা দেতেহেঁ।"

"চন্দ্রবাবুকা ঘরমে তো নেহি হ্যায় ?" এই কথা বলিয়া সে ব্যস্ত-ভাবে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেই নরেশ আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। তখন বড়ই বিপদে পড়িয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ননী কাঁহা ? জী!"

নরেশ তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল এবং কিছুকাল তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "সে ত স্কুলে গিয়াছে!"

সে উত্তর করিল, "টিফিন্ টাইমমে মেরে সামিল নাস্তা করনে আয়াথা ; বাদ্ উস্‌কে হাম্‌নে উছে নেহি দেখা।"

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ? তাহাকে দিয়া কি হইবে ?"

"উস্‌মে তুম্‌কো ক্যা দরকার হ্যায় ? দেখে হো তো বাত্‌লা দো।" এই কথা বলিয়া নরেশের পাশ কাটাইয়া সে চন্দ্রকান্তবাবুদের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। আমি তো হাসিয়াই অস্থির! নরেশ বেচারা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না,—কেবল হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় নরেশের দিদি আসিয়া খাইতে যাইবার জন্য আমাদিগকে ডাকিলেন।

তখন নরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, একটা মাড়োয়ারী ছোকরা ননীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চন্দ্রকান্তবাবুদের ঘরে ঢুকিল। ছোকরাটা কে হে ? তাহার দিদি উত্তর করিলেন, "ও ছোকরা ননীদের সঙ্গে পড়ে এবং প্রায়শই আমাদের এখানে আসিয়া থাকে। টিফিনের সময় ননীকে নিয়া বাহির হইয়াছে ; উহাতে কোন চিন্তার কারণ

নাই। "এখন বেলা প্রায় ২টা বাজে; তোমরা আসিয়া খাওয়া দাওয়া কর।" এই বলিয়া তিনি আগে আগে চলিলেন; আমরা তাঁহার পিছনে পিছনে যাইয়া খাইতে বসিলাম।

নরেশের ভগিনীর সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল না। তিনি বেশ বুদ্ধিমতী ও চতুরা। এই কয় দিনের পরিচয়েই তিনি আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমিও নরেশের সম্পর্কে তাঁহাকে দিদি বলিয়া ডাকিতাম এবং আপন ভগিনীর ন্যায়ই মনে করিতাম। তিনি আমাকে হাসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিতেছ কেন? সুরেশ!"

আমি উত্তর করিলাম, "ওটা আমার একটা রোগ বিশেষ, দিদি! নরেশ একটু কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমাকে দেখিলে ওর ও রোগটা আরও একটু বাড়ে।"

"পূর্ব্বে বাড়ুক আর না বাড়ুক, এখন থেকে বাড়িবেই" এই কথা বলিয়া আমি আরও বেশী হাসিতে লাগিলাম। "কেন, কি? হইয়াছে কি?" বলিয়া দিদিও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।

তখন "ভারি তো হাসির বিষয়!—সেই ছেলেটা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ননী কোথা? জী!" আমি উত্তর করিলাম, "স্কুলে গিয়াছে। কেন? তাহার খোজ করিতেছ কেন?" আর সেই হইতেই সুরেশ হাসিয়া অস্থির! এর ভিতরে যে কি হাসির বিষয় আছে, তাহা বুঝিয়া পাইলাম না।" রাগের মাথায় নরেশ এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল।

শুনিয়া আমি হো! হো! করিয়া হাসিয়া উঠিলাম; দিদিও হাসিয়া

পড়িলেন। তখন আমি বলিলাম, "যদি উহার ভিতরে কোন রহস্য না থাকিত, তাহা হইলে আর আমরা এভাবে হাসিতাম না। আমার কাছে সবই ধরা পড়িল, অথচ তোমার সহিত এত পরিচয় সত্ত্বেও তুমি দিদির কথাই ভুলিয়া গেলে,—নিজে কিছুই বুঝিতে পারিলে না। এটা পরিহাসের বিষয় নয় কি?"

নরেশের বুদ্ধি তখন ঘর লইল। সেও হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি সেটা ছেলে নয়? আমি তো তাই ভাবি! লীলার মুখখানার মত তার মুখখানা দেখা যাইতেছিল; সে কি তবে লীলা?"

সবই ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া দিদি তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যখন তোমরা সব বাহির হইয়া গেলে, তখন লীলা আমার ঘরে আসিয়া ননীর জামা জুতা পরিয়া বাবু সাজিতে গেল; কিন্তু তাহাতে তাহার চুল আর কিছুতেই লুকাইতে পারে না। দেখিয়া আমিই তাহাকে পাগড়ী বাঁধিয়া মাড়োয়ারী সাজাইয়া দেই। ঠিক তখনই তোমরা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, সে দরজা খুলিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিয়া পড়ে। পরে কি হয়, তাহা তোমরাই জান।"

শুনিয়া নরেশ বলিল, "তাইত! ছুঁড়ীটা ভারি ঠকাইয়া গিয়াছে! আমি ধরিয়াও ধরিতে পারিলাম না! যাহা হউক, পরে দেখা যাইবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় আমাদের আহারের সময়টা কাটিয়া গেল। আহারান্তে একটু বিশ্রামের পর, আমরা দু'জনে বাহির হইয়া বিডন্ স্কোয়ারে যাইয়া বসিলাম। সেখানে অনেক কথাবার্ত্তার পরে নরেশ বলিয়া বসিল, "ভাই! চল, এখন বাড়ী যাওয়া যাক্। কলিকাতা আর ভাল লাগে না।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? এত অল্পেই তৃপ্তি হইয়া গেল? দু'চার দিন থিয়েটার টার দেখিবে না?"

"না ভাই, আমার যেন কিছুই ভাল লাগিতেছে না। বাড়ীতেও সকলে আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন; এখানেও আজকাল অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। এখন বাড়ী যাওয়া যাক্; আবার তো এখানে আসিতেই হইবে।" এই বলিয়া নরেশ একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

আমি প্রতিবাদ করিলাম, "না ভাই আমার বেশ লাগিতেছে; বিশেষ সেটা তোমাদের নিয়াই! আর তোমার ভাল লাগিতেছে না? সে কি? তোমাকে তো কেউ বাঁধিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে না; তবে তুমি পলাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলে কেন? আমার তো ভাই, এখন যাইতে মোটেই ইচ্ছা নাই।"

নরেশ ঠিক সেই ভাবেই বলিল, তা থাকিবার তো কথাই নাই! তুমি তো আমার পাছে লাগিয়াই আছ। তুমি যদি নাও যাও, তথাপি কাল সকালে আমি বাড়ী রওনা হইব।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "তোমার এত ব্যস্ততার কারণ আমার বুঝিতে বাকি নাই। তবে জানিও পলাইয়া আত্মরক্ষা করা নিতান্ত কাপুরুষতা; তবটা স্বীকার করিলেও আজকাল তাহা করা সুকঠিন। সুতরাং তোমাকে ধরা দিতেই হইবে,—হাতকড়াও পরিতে হইবে।"

নরেশ প্রবোধ দিল, "তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তাহা কিছুতেই হইবে না। আমি এত ভীরু দুর্ব্বল নই যে কেহ ধরিয়া হাতে কড়া দিবে।"

আমি উপহাস করিলাম, "আচ্ছা, দেখা গিয়াছে; এই যে বাড়ী যাওয়ার জন্য এত আগ্রহ, এটাও তোমার বীরবিক্রমের একটা লক্ষণ বিশেষ, না?

নরেশ গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই! তুমি তোমার নিজের মন দিয়া সব বুঝিতেছ। পুরুষ তোমার মত দুর্ব্বল হয় না, যে একটা ছুঁড়ীকে দেখিয়া অমনি তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে।"

আমি আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম, "তুমি যে কত বড় বীরপুরুষ, নিজেই তাহার পরিচয় দিতেছ; আর বেশী কোন প্রমাণের দরকার নাই।"

"আমি তো আমার কথা বলি নাই,—বলিয়াছি তোমার কথা। তুমি যেমন বাঁধা পড়িয়াছ, আমি তেমন বাঁধা পড়িব না; আমার তবু পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার পথ আছে; তোমার তাহাও আছে কিনা সন্দেহ" এই বলিয়া নরেশ আমাকে উল্টা আক্রমণ করিল।

তখন আমার আত্মদৃষ্টি আসিল। ভাবিলাম, নরেশ নিশ্চয় প্রভার কথা জানিয়াছে। সেই আশঙ্কায়ই ও কথার আর বাড়াবাড়ী করিলাম না এবং উহা চাপা দিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে তোমার কালকে যাওয়াই স্থির?"

নরেশ উত্তর করিল, "কালকে যাওয়াই স্থির।"

"আচ্ছা, তবে তাহাই ঠিক; এখন চল, বাসায় যাইয়া বই কাপড় বাঁধিয়া ঠিক করিয়া রাখি; কাল সকালে উঠিয়াই বিছানাটা বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করা যাইবে।" নরেশকে এই কথা বলিয়া দেখি, বাড়ী যাওয়ার জন্য আমার মনটাও বেশ একটু ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, তাই আর অপেক্ষা না করিয়া তখনি নরেশকে নিয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম।

বাসায় যাইয়া দিদির কাছে না বলিয়া আগেই জিনিষপত্র গুছাইয়া বাঁধিতে লাগিলাম। দিদি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমরা যে কাপড় চোপড় বাঁধিতেছ? এখনই বাড়ী যাইতেছ নাকি? অন্ততঃ আফিস্ থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।''

আমরা উভয়েই বলিলাম, "না দিদি! আর অপেক্ষা করা যায় না; কাল সকালেই রওনা হইব। সকলেই আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন; আশীর্ব্বাদ করুন, পরীক্ষায় পাশ হই, পরে তো আবার কলিকাতায় আসিতেই হইবে।"

দিদি দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তবে তোমরা কাল সকালে যাইতে চাও। বহুদিন তোমাদের দেখি নাই, আর কয়েকটা দিন থাকিয়া গেলে ভাল বাসিতাম।"

নরেশ বলিল, "তাহা হইলেও, দিদি! তুমি আর বাধা দিও না। বাড়ী যাওয়ার জন্য সুরেশ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। তাই এখন আমরা যাই আবার তো আসিবই।"

আমার আবার তাহা সহ্য হইল না! এদিকে কার গরজে পুট্‌লী বাঁধি তাহার ঠিক নাই! অথচ বলিয়া বসিলাম, "দিদি! এই আমি হাত তুলিতেছি; আপনি যত দিন থাকিতে বলিবেন আমি তত দিনই এখানে থাকিব।"

নরেশের এমনই দশা! সে বলিয়া উঠিল, "না, না! সুরেশ! কালকে যাওয়াই স্থির! দিদি, সুরেশ একা নয় আমিও বাড়ী যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি; তুমি আর নিষেধ করিও না।"

তখন আমারি জয়,—সে আবার সকল রকমে। তাই "হাঁ, সে কথা স্বীকার কর" বলিয়া আমি আরও আটিয়া মোট বাঁধিতে

লাগিলাম। এমন সময় দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তুই এখানে আয় না! তোর কোন ভয় নাই!"

কথাটা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আমার কান খাড়া হইল। সে ইসারায় দিদিকে ডাকিতেছিল, তাহাকে চিনিতেও বিলম্ব হইল না। সে মুখে কিছু বলিত না বটে, কিন্তু তাহার ভাবে কথা কহিত,— আর সেটা বড়ই দৃষ্টিমধুর।

আবারও দিদি "আ! মরণ! আচ্ছা যাই" বলিয়া চন্দ্রকান্তবাবুদের একটা ঘরে ঢুকিলেন এবং কিছুকাল পরে বলিয়া উঠিলেন, "কাল সকালে।" আবার একটু কাল পরে বলিলেন, "বাড়ীতে সকলে উদ্বিগ্ন আছেন বলিয়াই এত শীঘ্র যাইতেছে; পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই আবার চলিয়া আসিবে।"

তখন আমি একটু হাসিয়া, "প্রশ্নকটা ভাবার্থসমেতই গোপন রহিল! না হবে কেন! বিধেরপি সারসিকঃ প্রয়াসঃ পরস্পরং যোগ্য-সমাগমায়" এই কথা বলিয়া, হাত দু'খানা চিৎ করিয়া নরেশের সামনে ধরিতেই নরেশ আমাকে এক ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল; এবং রাগে চোকমুখ ভার করিয়া দিদিকে ডাকিয়া বলিল, "দিদি তোমার যদি কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে আজই আসিয়া বলিয়া রাখ; কাল সকালে আবার তোমার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিব না।"

দিদি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং তখনই নরেশের নিকট তাঁহার সব খবর বলিতে বসিলেন। তখন নরেশের উপর আমার এমন রাগ হইল যে তাহা আর বলিতে পারি না। কি করি দিদির সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে না পারিয়া কেবল চোক রাঙাইয়া চাহিতে

লাগিলাম। নরেশ একবার আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া রাখিল ;— পরে আর ফিরিলই না।

আমি আর কি করিব ? রাগে রাগে বসিয়া ফুলিতে লাগিলাম। এমন সময়ে চন্দ্রকান্তবাবু ও হরেনবাবু আফিস্ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা আমাদের যাওয়ার উদ্যোগ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি ! তোমারা কখন যাইতেছ ?"

নরেশ উত্তর করিল "কাল সকালে।"

তাঁহারা বলিলেন, "আর কয়েকটা দিন থাকিয়া যাও না।"

নরেশ আবার উত্তর করিল "না, বাড়ীর জন্য মন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে ; তাই কাল সকালে যাওয়াই স্থির করিয়াছি।"

তখন তাঁহারা আর কোন কথা না বলিয়া যার যার কাজে চলিয়া গেলেন। হরেনবাবু তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া "ননী ! ননী ! বলিয়া ডাকিতেই, দিদি উঠিয়া গেলেন। আমরা আর কি করি ? দু'জনে বসিয়া ননীর কথাই ভাবিতে লাগিলাম। পরে হরেনবাবুও আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং গল্পগুজবেই সে রাত্রিটা কাটিয়া গেল।

পরের দিন সকালে বিছানাপত্র বাঁধার পরে হরেনবাবু, চন্দ্রকান্তবাবু প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া আমি রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম ; কিন্তু নরেশ আর দিদির ঘর হইতে কিছুতেই বাহির হয় না। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে আমি যাইয়া দেখি, নরেশ কালিদাসের সেই 'ন যযৌ, ন তস্থৌ'র ভাবে দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে ; দিদির পার্শ্বে আকুল উৎকণ্ঠার সহিত ননীও দাঁড়াইয়া আছে। এবার শুধু দিদির কেন নরেশের কথাও আর ফুরাইতেছে না।

আমাকে দেখিয়াই নরেশ ব্যস্তভাবে বলিল, "হাঁ চল, এখনই যাইতেছি।" আমি বলিলাম, "না! সেরূপ ভাব তো দেখিতেছি না!" শুনিয়া নরেশ "তবে এখন আসি দিদি!" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তখন আর অপেক্ষা না করিয়া উভয়েই ষ্টেসনের দিকে রওনা হইলাম।

শিয়ালদহ পৌছিয়া আমরা যথাসময় ট্রেনে উঠিলাম। তখনই নরেশের একটু ভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হইল। বাড়ী যাওয়ার জন্য তাহার সে আগ্রহ যেন আর নাই; সে যেন হাত পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছে। ক্রমশই অত্যন্ত লোকের ভিড় হইতেছে; দ্বারে বসিয়া থাকিলেও, সে কোনরূপ বাধা দিতেছে না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ভাবিলাম, "যাহার যত বীরত্ব যত অস্ফালন, সবই ঐ এক জায়গায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহার অন্তরালে যে কোন তাড়িতশক্তির ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহা জড়বিজ্ঞান অদ্যাপি বাহির করিতে পারে নাই; মনোবিজ্ঞানের একটা নাম শুনা যায় সত্য, কিন্তু অদ্যাপি তাহার এত উন্নতি হয় নাই যে, সেই শক্তির সংযোগ বিয়োগ করে। জানিনা এমন দিন কবে আসিবে, যখন বিজ্ঞানের সাহায্যে এই আকর্ষনী শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশকালপাত্রানুসারে তাহার প্রয়োগ করা যাইবে।

১০টার সময় ট্রেন আসিয়া আমাদের ষ্টেসনে থামিল। তখনও নরেশের সেই একই অবস্থা; সেখানে যে নামিতে হইবে তাহা যেন সে ভুলিয়া গিয়াছে। আমি যাইয়া তাড়া দিতে তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র নিয়া দু'জনে নামিয়া পড়িলাম। নরেশ তাহাদের বাড়ী চলিয়া গেল; আমিও আমাদের বাড়ী যাইয়া উপনীত হইলাম।

তখন সকলেই আসিয়া সংবাদ জানিবার জন্য আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমি বাবা ও মাকে নমস্কার করিয়া, একে একে সব সংবাদ বলিলাম। পরে আমি বাড়ী না থাকায় মা, এতদিন কি ভাবে কাটাইয়াছেন,—এ কয়দিন ধরিয়া কি ভাবে আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, সে সব সংবাদ নিজেই বলিলেন। 'আমি সেই দিনই পৌছিব' রাধা একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছিল; বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেবল প্রভা নীরবে মায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সকলের কথা শুনিতে লাগিল!

এই ভাবে কিছুকাল কাটিয়া গেলে বইগুলি যথাস্থানে রাখিবার জন্য আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, "কে যেন ঘরটীকে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। কাগজ, কলম, খাতা পত্র, বই, আয়না চিরুণী প্রভৃতি যতকিছু বিক্ষিপ্তভাবে ফেলাইয়া গিয়াছিলাম, তাহার সকলই যথাস্থানে পরিপাটিরূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ঘরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; বিছানাটীও তদ্রূপ পরিষ্কারপরিচ্ছন্নভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, কে যেন আমারও সেইরূপ পারিপাট্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। যাহা হউক, তাহাতে আমি বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিলাম। এবং তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই বইগুলি সাজাইয়া রাখিলাম।

প্রভার পক্ষে আমার নিকটে আসার কোনরূপ বাধা না থাকিলেও তখন আর প্রভা বড় নিকটে আসিতে চাহিত না;— দূরে দূরে থাকিয়াই সে আমার অভাব অভিযোগগুলি সারিবার চেষ্টা করিত। যখন যে জিনিসটার দরকার, চাহিবার পূর্ব্বেই, সে তাহা আনিয়া পৌছাইয়া দিত; অথচ বিনা প্রয়োজনে কোন কথা বলিত না।

প্রভা পূর্ব্বেই একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল ; শেষে সেইটুকু বাড়াইবার জন্য তাহার আগ্রহ জন্মিল। আমিও তাহাকে সে বিষয় সাহায্য করিতে যত্নবান্ হইলাম। আমার নিকট যে সব বাঙ্গালা বই ছিল, এক এক করিয়া নিয়া সে তাহার সবই পড়িল। শেষে লাই-ব্রেরী হইতে গৃহলক্ষ্মী, সাবিত্রী, সতী প্রভৃতি স্ত্রীপাঠ্য বই এক একখানা করিয়া আনিয়া দিতে লাগিলাম ; আর সে তাহা পড়িয়া শেষ করিয়া ফিরাইয়া দিতে লাগিল। আমি দিনের বেলায় প্রায়শই ঘুরিয়া বেড়াইতাম ; রাত্রে কোন দিন বা গল্পগুজব, কোন দিন বা গানবাজনা করিয়া সময় কাটাইতাম। এই ভাবে পরীক্ষার পরের কটা মাস এক-রূপে কাটিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:#:—

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগে আমাদের পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমি ও নরেশ উভয়েই প্রথমবিভাগে পাশ করিলাম। তাহাতে সকলেই অত্যন্ত উৎসাহিত হইল; যে পিয়ন টেলিগ্রাফের সংবাদ নিয়া আসিয়াছিল, বাবা তাহাকে দুই টাকা পারিতোষিক প্রদান করিলেন এবং পাঁচ টাকার মিঠাই আনিয়া তা'দ্বারা হরির লুট দিলেন। নরেশের পিতা শ্যামাচরণবাবুও সকলকে মিঠাই খাওয়াইয়া অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিলেন।

আমাদের উৎসাহ আমোদের তো কথাই নাই। প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছি বলিয়া তখন একটা বিশিষ্ট আত্মগৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম। আর সর্ব্বমুখে আমাদের যে প্রশংসাস্রোত বহিতেছিল, তাহাতে ভাসিয়া এমনই একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম যে, 'আই, এ' পড়িবার জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল এবং যাহাতে চিরদিনই এইরূপ প্রশংসাভাজন হইতে পারি, তজ্জন্য একটা বিশেষ চেষ্টা আসিল। তাই আর বেশী দিন বাড়ীতে অপেক্ষা করা সঙ্গত না মনে করিয়া শীঘ্রই একটা ভাল দিন দেখিয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। "মাসের ভিতরে অন্ততঃ তিনখানা করিয়া চিঠি দেওয়া এবং এক সঙ্গে দুই দিন ছুটী পাইলেই একবার বাড়ী আসার কথা" মা পুনঃ পুনঃ

বলিয়া দিলেন। প্রভা মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলিতে পারিল না; যতদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল, সে স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

নরেশ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া ষ্টেসনে পৌছিল। তখন উভয়ে মিলিয়া ট্রেনে উঠিয়া স্থির করিলাম, কলিকাতা পৌছিয়া প্রথমে হরেনবাবুদের বাসায় যাইব; কলেজে ভর্ত্তি হইয়া, পরে দেখিয়া শুনিয়া থাকার জন্য মেচ্ কি বোর্ডিং যাহা হউক একটা ঠিক করিয়া নিব।

কলিকাতায় পৌছিয়া সেই পরামর্শ অনুসারে প্রথমে হরেনবাবুদের বাসার খোজে শ্যামবাজারে যাইয়া দেখি, সে বাড়ীতে তাঁহারা নাই। কোথায় গিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করায় কেহ ঠিকানাও বলিতে পারিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সেই 'বোর্ডিং'এ যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আপাততঃ সেখানে থাকাই স্থির করিয়া দু'জনেই সিটী কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।

কলেজে ভর্ত্তি হইয়া প্রথমতঃ খুব স্ফূর্ত্তিতেই দিন কাটিতে লাগিল কলেজে স্কুলের মত আর জিজ্ঞাসাবাদ নাই; কোনমতে পারসেন্টেজ্ টা রাখিতে পারিলেই খালাস,—লেক্চার সব শুনিলেও হয়, না শুনিলেও হয়। বাজারে নোট্ যাহা আছে তাহা পড়িলেই পাশ করা যায়। সুতরাং পড়াশুনার দিকে তত মন ছিল না, কেবল আমোদপ্রমোদেই দিন কাটাইতাম।

কিছুদিন পরেই শিল্ড্ ম্যাচ্ আরম্ভ হইল। প্রত্যেক দিন কলেজ হইতে আসিয়াই ম্যাচ্ দেখিতে যাইতাম এবং সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিয়া ঐ এক আলোচনায়ই রাত্রি কাটাইয়া দিতাম।

একদিন ম্যাচ্ দেখিতে যাইয়া হরেনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের খবর জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে শ্যামবাজারে তাঁহারা

যে বাড়ীতে থাকিতেন, লিজ্ ফুরাইয়া যাওয়ায় জমিদার সে বাড়ী থেকে তাহাদের উঠাইয়া দিয়াছে ; পরে চন্দ্রকান্তবাবুর সহিত একত্র থাকিতে পারেন এরূপ বাড়ী খুঁজিয়া না পাওয়ায়, দিদিকে তাঁহাদের নিজ বাড়ী চুঁচুড়ায় পাঠাইয়া দিয়া তিনি আপাততঃ মালাঙ্গালেনে একটা 'বোর্ডিং'এ আছেন। আর চন্দ্রকান্তবাবু পটলডাঙ্গায় একটা বাসা ভাড়া করিয়া সপরিবারে সেইখানেই আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করায় আমরাও আমাদের সংবাদাদি বলিলাম এবং খেলা শেষ হইলে তাঁহাদের বোর্ডিং হইয়া বাসায় ফিরিলাম।

কয়েক দিন পরে ঘুড়ী খেলার এক খেয়াল চাপিল। বেড়াবার ইচ্ছা মাঝে মাঝে হইত বটে ; কিন্তু সে ভারটা নরেশের উপর দিয়া, কলেজ হইতে আসিয়া শেষবেলায় প্রায়শই আমি ঘুড়ী উড়াইতাম। যাহারা ছেলে ভাল হয়, তাহারা যে দিকে যায় সেই দিকেই ভাল হইয়া উঠে। তাই অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যাটায় আমার এতদূর পারদর্শিতা লাভ হইল যে, কোন ঘুড়ীই আমার কাছে আসিতে সাহস করিত না— আসিলেই তাহা কাটিয়া ফেলিতাম।

একদিন বাতাসের তত জোর ছিল না। ঘুড়ীটা তুলিয়া আবার আমার নামাইয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইতেছিল, এমন সময় নরেশ আসিয়া আমার হাত হইতে ঘুড়ীটা নিল। আমি তাহাতে কোন আপত্তি করিলাম না ; বরং তাহাকে একটু জব্দ করিবার জন্য নিজেই ছাড়িয়া দিলাম। প্রথমে ঘুড়ী খেলায় তাহার অকুশলতা দেখিয়া বেশ একটু আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলাম ; কিন্তু শেষে তাহাতে মহা বিপদে পড়িয়া গেলাম। বাতাসের অভাবে ঘুড়ীটা নরেশের হাত হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল ; —নরেশ আর সামলাইতে পারিল না। ঘুড়ীর সূতাটা একেবারে নীচু হইয়া পড়িল ; আর ঘুরে

একটা দালানের ছাদ হইতে একটা মেয়ে সূতাটার মাঝামাঝি স্থানে ধরিয়া ঘুড়ীটা সামলাইয়া নিল এবং সেখানে বসিয়াই তাহা উড়াইতে লাগিল। মেয়েটা এমনি চালাক যে, আমরা সূতায় টান দিলেই সে আঁটিয়া ধরিত; আর আমরা ঢিল দিলেই সে একটু একটু করিয়া টানিয়া নিত। আবার মাঝে মাঝে সিড়ীর কাছে আসিয়া 'আমরা কি করি, না করি' দেখিয়া যাইত; এইভাবে সে নরেশের সঙ্গে লুকোচুরী খেলিতে আরম্ভ করিল।

যে ছাদের উপর হইতে সে এইরূপ কাণ্ড করিতেছিল, সে ছাদটা এতদূর যে, তার উপরের লোক চেনা যায় না। আর তাহার দক্ষিণ দিকের একপাশ দিয়া সিড়ী উঠিয়াছে; অপর পাশটা আলিসায় বেষ্টিত। সিড়ীর কাছে আসিলে মেয়েটাকে দেখা যাইত; আলিসার আড়ালে গেলে আর দেখা যাইত না। তাহার সঙ্গে হার মানিয়া নরেশ যখন বিষণ্ণভাবে বসিয়া পড়িল, তখন আমার আর সহ্য হইল না। আমি নরেশের হাত হইতে সূতাটা লইয়া জোরে টান দিতেই সূতাটা কাটিয়া গেল। তখন রাগে রাগে অবশিষ্ট সূতাটা গুটাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু এভাবে রণে ভঙ্গ দিতে হওয়ায় অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইল; মনে মনে সংকল্প করিলাম যদি কাল আবার ঐ ঘুড়ীখানাই উড়ায়, তাহা হইলে আর একখানা দিয়া জড়াইয়া ওখানা আনিবই আনিব। তখন নরেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ভাই! দেখিলে, ছুঁড়ীটা আমাদের কি ভাবে জব্দ করিল।"

নরেশের উপর পূর্ব্বেই আমার একটু রাগ হইয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া সেটা বিরক্তিতে পরিণত হইল। বলিলাম, "তুমি ছুঁড়ীদের কাছে চিরদিনই তো জব্দ হইতেছ; তাহাতে আর দুঃখের

বিষয় কি আছে? ঘুড়ী তো সামান্ত বস্তু! ইহার পরে তোমার যথাসর্ব্বস্বই কাড়িয়া নিবে! আর তুমি ভোলানাথ 'হাঁ' করিয়া চাহিয়া দেখিবে।

নরেশ উত্তেজিত হইয়া কহিল, "আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিবে, আর আমি চুপ করিয়া থাকিব! তাহা কখনও মনে স্থান দিও না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা বেশী আর কি করিবে?"

"কি করিব? এমন কর্ম্ম আর না করিতে আসে, তাহা আমি করিয়া ছাড়িব; এত রাজ্য জ্বালাইয়া পোড়াইয়া শেষে ছুঁড়ীদের কাছে হার মানিব?" বলিয়া নরেশ আস্ফালন করিতে লাগিল।

আমার অতটা ভাল লাগিল না। উত্তর করিলাম, "তুমি কেন? স্বয়ং শুম্ভনিশুম্ভ ত্রিভুবন বিজয়ী হইয়াও শেষে একটা ছুঁড়ার কাছেই হার মানিয়াছিল।"

শুনিয়া নরেশ একটু থামিল; তথাপি গরিমাটুকু না ছাড়িয়া বলিল, "যদি সে রকম ছুঁড়ী হয়, তবে তাহার নিকট হার মানিতেও সুখ আছে।"

আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ যে কোন রকমের ছুঁড়ী তাহা তুমি কি দিয়া ঠিক করিলে?

নরেশ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "যে ভাবেই হউক তাহা ঠিক করিতেই হইবে। মোটের উপর কাল আর আমার কলেজে যাওয়া হইবে না—তোমাকে একটা প্রক্সি দিতে হইবে।"

"আচ্ছা, দেখা যাইবে,—তোমার কতদূর ক্ষমতা" বলিয়া আমি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলাম। নরেশ সেই ছাদের উপর বসিয়াই মতলব আঁটিতে লাগিল।

পরের দিন সকালে উঠিয়া দেখি, নরেশ কোথায় পালাইয়াছে। প্রথমে মনে করিলাম, "হয় ত সে সেই বাড়ীটা ঠিক করিবার জন্য বাহির হইয়াছে; শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিবে।" কিন্তু সে যখন বেলা ১০টার মধ্যেও ফিরিল না, তখন আমার একটু চিন্তা হইল। একবার ভাবিলাম, তাহার খোজে বাহির হই; আবার মনে হইল কলিকাতা সহর খুজিয়া একটা লোক বাহির করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর কালকে তো সে একথা বলিয়াই গিয়াছে; সুতরাং তাহার খোজে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাই নরেশের অপেক্ষা না করিয়া আহারান্তে আমি কলেজে চলিয়া গেলাম।

৪টার পরে কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনও নরেশ ফিরে নাই; ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে আসিয়া খাইয়াও যায় নাই। তখন আবার একটু চিন্তা হইল। ভাবিলাম, "যে কোন খোজেই যাক্ না, এখনও ফিরিয়া না আসার কারণ কি? তার খোজেই বা এখন যাই কোথা?"

ভাবিতে ভাবিতে নিজের সিটে যাইয়া বসিয়াছি, এমন সময় এক বৈরাগী ঠাকুর আসিয়া গান ধরিল :—

সাধে কি বৈরাগী সাজি!
ঘুরিয়ে দ্বারে দ্বারে খেলি কত
ভোজের বাজি!

(সাধা) এই রাধাকৃষ্ণ নামের বলে
কত প্রেমনদীতে বান উথলে;
ফোটে ফুল শুকনো ডালে;
এ নামগানে ভাই, সবাই রাজি।

আমার এই খঞ্জনীটায় গুঞ্জরিলে
কত জীবনকুঞ্জে মলয় খেলে ;
ফোটা ফুল আপনি ঢলে
পড়ে ; আমি ভরি সাজি ॥

আমার এই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিলে
ডিটেক্‌টিভের মোহন বলে,
কত লুকোচুরী ধরি ফেলে ;
আপন লীলায় আপনি মজি ॥

এই গান শুনিয়া আমি নীচে নামিয়া আসিলাম। 'বোডিং'এর অন্যান্য মেম্বরেরাও নামিয়া আসিয়া বৈরাগী ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গানটা শেষ হইয়া গেলে সকলেই বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, আর একটা গাও।" "আচ্ছা, একটা আত্মতত্ত্ব গাই" বলিয়া সে আবার গান ধরিল :—

(ও) মধুর ভাবাবেশে প্রেমাকাশে,
মন ঘুড়ীটা উড়্‌তেছিল।
প্রাণের এই সূক্ষ্মসূত্রে তারি গাত্রে
আমার সবি বাঁধা ছিল।

যৌবনপবনহিল্লোলে হেলে দুলে
কত খেলাই খেলতেছিল ;
কভু বা আপনভাবে আপনি ভুলে,
আপনি ঢলে পড়্‌তেছিল ॥

কে যেন আড়াল থেকে হায়! কোন বাকে,
তারে ফাঁকে ধরে নিল।

এভাবে চুরী করে, কেমন করে,
সে তার প্রাণে রাখবে বল।

গানটা শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর! তোমার নামটা কি?"

সে উত্তর করিল, "আমার নাম? আজ্ঞে, প্রেমদাস বাবাজী।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠাকুর, তোমাকে যেরূপ প্রেমিক দেখিতেছি, তাহাতে তোমার নাম প্রেমদাস না হইয়া 'প্রেমপ্রভু বাবাজী' হওয়াই উচিত ছিল।"

বৈরাগী ঠাকুর তাহাতে আক্ষেপ করিল, "আমি কি আর প্রেমিক! প্রেমিক সব বৃন্দাবনে! তা'দের দাস কেন, আমিত বৃন্দাবনগলিত-পত্রভক্ষকক্রিমিদাসও নই। ভগবৎপ্রেম কি হাসিখেলা? উহা জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল। জয় রাধেকৃষ্ণ, এবার ভিক্ষা দাও, বাবা!

আমি একটী টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "ভিক্ষা কেন? ঠাকুর! এই নাও তোমার প্রণামী। আমি আজ হইতে তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম; এখনি আমাকে তোমার ঐ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দাও।" এই বলিয়াই আমি তাহার হাত ধরিয়া উপরে নিয়া চলিলাম। সে নিরাপত্তিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরে প্রবেশ করিল। সেই ব্যাপার দেখিয়া বোর্ডিংএর সব লোক আসিয়া আমাদের ঘরের দুয়ারে ঝুকিয়া পড়িল। আমি তাড়া-তাড়ি সামনের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলাম, "তোমরা সব সরিয়া যাও;—দীক্ষার সময় কাহারও দেখিতে নাই।" তাহারা ইহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া গিয়া, কেহ অনুমান করিল, বৈরাগী ঠাকুর আমার পরিচিত কোন ডিটেকৃটিভ, কেহ

মনে করিল, সে ছদ্মবেশী আমার কোন বন্ধু; কেহ বা তাহাকে খাটি নরেশ বলিয়াই নিশ্চয় করিয়া ফেলিল।

সকলে সরিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল দেখি নরেশ! কোথা হইতে এ বেশ সংগ্রহ করিলে, আর তোমার ডিটেক্টিভের মোহন বলেই বা কালকার লুকোচুরীটার কতদূর অনুসন্ধান করিলে?"

নরেশ হাসিয়া বলিল, "সবই অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছি। ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, শুন;— আজ সকালে বৈরাগীর আখড়ার খোজে নারিকেলডাঙ্গা পর্য্যন্ত যাই। অনেক অনুসন্ধানের পর ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা আখড়া মেলে। সেখানে একটা পোষাকের কথা জিজ্ঞাসা করায় এই নূতন পোষাকটা দেখাইয়া এক বৈরাগী ঠাকুর বলে নয় সিকা ব্যয় করিয়া এই পোষাকটা তৈয়ার করিয়া আনিয়াছি যদি তিন টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে এইটাই দিতে পারি।" আমি তিন টাকা দিয়াই পোষাকটা কিনিয়া লই; পরে এই খঞ্জনীটা এক টাকা দিয়া কিনিয়া সেখান হইতেই বৈরাগীর সাজে কলিকাতায় ফিরি। তার পরে সিয়ালদহ হোটেলে খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা ঠিক বারটার সময় খুজিতে খুজিতে যে বাড়ীর ছাদ হইতে আমাদের ঘুড়ীটা ধরিয়াছিল, সেই বাড়ীতে যাইয়া "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া উপস্থিত হইতেই দেখি, "পুরুষ এক প্রাণীও ঘরে নাই; গিন্নীরাও সব আহারান্তে বিশ্রামসুখলাভার্থ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন; আর বৌঝিরা সব দোতালার ঝুলবারান্দায় বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই তাহারা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! তুমি একা যে?"

আমি উত্তর করিলাম, "কি করি আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী পছন্দ হইতেছে না।"

তখন একটী বিধবা বৌ লীলার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ তো ইহাকে তোমার পছন্দ হয় কিনা? তুমি যেমন নবীন বৈষ্ণব, এও তেমনই নবীনা বৈষ্ণবী হইবে।"

"হাঁ, পছন্দ হইতে পারে, যদি এ গান গাইতে জানে।" ভ্রূদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া আমি এই কথা বলিতেই সকলে হাসিয়া পড়িল। পরে হাসিটা একটু চাপিয়া সেই বিধবা বৌটীই আবার বলিল, "হাঁ, এ গাইতেও পারে, আর এমনি ওস্তাদ যে সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ীখেলাও করিতে পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কেমন?"

তাহাদের সামনেই ঘুড়ীখানা পড়িয়াছিল। সে তাহা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ, কাল ছাদে বসিয়া গাহিতে গাহিতে এক ফাঁকে এই ঘুড়ীখানা একটা ছেলের হাত হইতে কাড়িয়া নিয়া এ যে কত খেলাই খেলিয়াছে, তা আমরা জানি, আর সেই ছেলেটাও কিছু জানিতে পারিয়াছে। কেমন! এখন পছন্দ হইল তো?"

"যাহা হউক, সেই গানটার বিষয় একটু পরীক্ষা চাই।" আমি এই কথা বলিতেই সে উত্তর করিল, "তাহার পরীক্ষাটা তোমারই আগে দিতে হয়।" "আচ্ছা, আমিই আগে দিতেছি" বলিয়া তখনই গান ধরিলাম :—

(ও) মধুর ভাবাবেশে . প্রেমাকাশে,
মনঘুড়ীটা উড়তেছিল।
প্রাণের এই সূক্ষ্মসূত্রে তারি গাত্রে
আমার সবি বাঁধা ছিল।...

গান শুনিয়া তাহারা সকলেই, "বা! বেশ গাহিয়াছ! বেশ! এই-রূপ আর একটা গাও তো," বলিয়া হাসিতে হাসিতে লীলার দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। লীলার তখন একটু ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিলাম। সে পূর্ব্বে বেশ অভিনয় করিয়া যাইতেছিল; কিন্তু গানটা শুনিয়া যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল এবং অনুসন্ধিৎসুনয়নে আমার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন সময় আমি আবার গান ধরিলাম :—

সাধে কি বৈরাগী সাজি!
ঘুরিয়ে দ্বারে দ্বারে খেলি কত
ভোজের বাজি!...

গানটার শেষ পদ গাহিতেই আবার সকলে লীলাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে লাগিল। সেবার আর তাহার সহ্য হইল না, —সে বলিয়া ফেলিল "এ একটা কোথাকার অসভ্য বদমায়েস হে? ইহাকে তাড়াইয়া দাও তো!"

"আমি নিজেই চলিয়া যাইতেছি,—আমি আর ভিক্ষাও চাই না, বৈষ্ণবীও চাই না! আপনাদের পায়ে পড়ি! শুধু আপনারা আমার উপর অপ্রসন্ন না হইলেই সন্তুষ্ট" তাহাদের নিকট এই মিনতি করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ সে বাড়ীর বাহির হইয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু একেবারে বাসায় আসিয়া পৌছিতে পারিলাম না; ভেকের গুণে আমার আবার একটু ভিক্ষাও করিতে ইচ্ছা হইল। মনে করিলাম "শুধু গালা-গালি খাইয়াই ফিরিব! দেখি, আর কিছু পাই কিনা?" তাই কয়েকটা মেচ্ বোর্ডিং ঘুরিয়া ঐ দুই গান গাহিয়াই দেখ, সেই সাড়ে চারি টাকা নিয়া আসিয়াছি।

আমি প্রশ্ন করিলাম "মেয়েদের কাছে বুঝি আর যাইতে সাহস হইল

না ; তাই 'মেচ্ বোর্ডিংএ' পুরুষ ঠকাতে গেলে, না ?"

নরেশ মেয়েদের নামেই যেন চমকিয়া উঠিল ; বলিল "ওঃ বা—বা ! মেয়েরা যে পুরুষের বাবা ! লীলা যখন চোখ রাঙাইয়া চাহিয়াছিল, তখন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া রক্ষা ; না হইলে যে মদনভস্মের পুনরভিনয় হইত।

আমি বলিলাম "তোমার ও ছাই ভস্মের কথা রাখিয়া দাও ; এখন জিজ্ঞাসা করি, সে যে লীলা তাহার প্রমাণ কি ?"

নরেশ উত্তরে পুনরায় প্রশ্ন করিল "বল দেখি, তুমি যে সুরেশ তাহার প্রমাণ কি ?"

"প্রমাণ আমার রূপ, আর তোমার মন" আমি এই উত্তর করিতেই নরেশ উত্তর করিল "লীলা যে লীলা, তাহার প্রমাণও তাহার রূপ, আর আমার মন।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা লীলা কি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে ?"

নরেশ উত্তর করিল "নিশ্চয়ই ! প্রিয়জনকে চিনিতে বালকেও ভুল করে না !

"তুমি কি করিয়া জানিলে যে, সে ভুল করে নাই" আমি এই প্রশ্ন করিতেই নরেশ বলিয়া উঠিল "দেখ স্ত্রীলোকের দৃষ্টিশক্তি অমনই কিছু তীক্ষ্ণ ; কারণ ঘোমটার ভিতর হইতে তাহারা যাহা দেখিতে পায়, আমরা চশমা দিয়াও তাহা দেখিতে পাই না। তাহার উপর আরও তীক্ষ্ণতা বাড়াইয়া সে যখন আমার উপর চাহিয়াছিল, তখন আমার মনে হইল, "এই বুঝি আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্তও চিনিয়া নিল।

"তাহা হইলে তাহার পরিচয়ই পাওয়া যাইবে" আমি এই অনুমান করিতেই "দেখা যাক্ কি হয়" বলিয়া নরেশ হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার 'রোম্যাঞ্চ'এর জন্য নরেশকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম "পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজ হইতে আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম। এবার গুরুজীর ঐ পোষাকটা আর খঞ্জনীটা আমাকে দাও। দেখি, আমিও একটা শিকার ধরিতে পারি কি না ?"এই কথা বলিয়া আমি সেই পোষাকটা চাহিয়া নিলাম। পরে বৈরাগী সাজিয়া খঞ্জনীটা নিয়া বাহির হইতেই সকলে আসিয়া গুরুজীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। গুরুজী ঘরে ধ্যানস্থ হইয়া আছেন" বলিয়া আমি আবার গান ধরিলাম "সাধে কি বৈরাগী সাজি ?"

সেই গান শুনিয়া গুরুজীর ধ্যানভঙ্গ হইল; তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; আসন পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেই সকলে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তিনি এ পোষাক কোথায় পাইলেন, কেই বা তাঁহাকে দীক্ষিত করিল। তখন গুরুজীর কেরামত কত! তিনি এক কথায় উত্তর করিলেন "গুরোঃ কৃপা হি কেবলং"। তখন সকলেই নিরুত্তর হইয়া গেল, সাহস করিয়া কেহ কোন-কথাই বলিতে পারিল না। কেবল প্রীতি ও বিস্ময়ের চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া সকলেই গুরুর মহিমা বিস্তার করিতে লাগিল।

এইরূপ হাস্যকৌতুকেই সে দিনটা কাটিয়া গেল। ঘুড়ী আর উড়ান হইল না,—উড়ান সঙ্গত বলিয়াও মনে হইল না; কারণ তাহা হইলে 'বোর্ডিং'এর অন্যান্য মেম্বরেরা হয়ত ধরিয়া ফেলিবে যে আমাদের ঘুড়ী-খেলার সঙ্গে বৈরাগী সাজের কোন সম্বন্ধ আছে।

পরের দিন আমরা আবার যথা সময়ে ঘুড়ী উড়াইলাম; কিন্তু সে

দিন সে ছাদে আর কেহ আসিল না। শেষে আমরা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া অনুমান করিলাম "পূর্ব্বদিন নিশ্চয়ই লীলা নরেশকে চিনিয়া ফেলিয়াছে— হয়ত সেই কারণেই আর ছাদে উঠিতে সাহস পাইতেছে না।" এই ভাবে পর পর তিন দিন কাটীয়া গেল ; আমরা ঘুড়ী নিয়া ছাদে উঠিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিতে লাগিলাম। তখন লীলা কি ভাবে কি করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য মনটা এতই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল যে তাহার সংবাদে একটা কিছু না পাইলে দিন কাটানই ভার হইয়া উঠিল।

চতুর্থ দিন পিয়ন আসিয়া নরেশের হাতে এক খানা চিঠি দিয়া গেল। চিঠি খানা এক খানা নীল কভারে ভরা ; উপরের ঠিকানাটা দেখিলেই মনে হয়, স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। নরেশ চিঠি খানা খুলিয়া নীরবে পাঠ করিতে লাগিল ; আমিও তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলাম —

"নরেশ বাবু !

সে দিন আপনাকে অসভ্য বদমায়েস বলিয়া গালাগালি দেওয়া অবধি আমি যে কিরূপ মনস্তাপ ভোগ করিতেছি তাহা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন আর কেহই জানিতেছে না। যাহার অভ্যর্থনার্থ প্রীতিসম্ভাষণ খুজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাকে অকারণ তিরস্কার করায় যে কিরূপ অনুতাপ হয়, তাহা আমি এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি ; নিজেই ডাকিয়া আনিয়া প্রিয়জনকে আদর করিবার পরিবর্ত্তে যদি তাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপনার নিকট আপনি যে কতদূর অপরাধী হইতে হয়, তাহাও প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া নিতেছি। যতই দিন যাইতেছে ততই নিজকে নিজে আরও বেশী অপরাধিনী বলিয়া মনে করিতেছি।

বাল্যস্বভাবচপলতার ফলে যে অপরাধ করিয়া বসিয়াছি, প্রাণ দিলেও যদি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইত, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, আপনি নিজগুণে ক্ষমা করিলেও, কদাপি এ অপরাধ বিস্মৃত হইতে পারিব না এবং আমাকে চিরকালই আপনার নিকট অপরাধিনী হইয়া থাকিতে হইবে। আপনি যদি অন্তর্যামী হইতেন, একমাত্র তাহা হইলে মনটাকে কতকটা প্রবোধ দিতে পারিতাম এবং আমার এ দুঃখ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত।

যে দিন ছাদে বসিয়া দূরবীক্ষণের সাহায্যে আপনাদিগকে লক্ষ্য করি, সেই দিন হইতেই আপনাকে দেখিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। জানি না, সেই আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়াই আপনার হাত হইতে ঘুড়ীটা ধরিয়াছিলাম কিনা? ভগবান্ আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াও করিলেন না। ইচ্ছা ছিল, সে দিন আপনাকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইব, তাহার অতি সুন্দর সুযোগও জুটিয়াছিল। কিন্তু হিতে বিপরীত হইয়া গেল, আজ আমাকে দেখাইবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি যে, এত লিখিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমার অন্তরের ভাষা যদি আপনি বাহিরে পাঠ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তৃপ্তি হইত। জানি না, অদৃষ্টে কি আছে! আপনার নিকট এইমাত্র অনুরোধ, আপনি এ চিঠিখানার একবর্ণও মিথ্যা বলিয়া মনে করিবেন না।

আপনার প্রিয়বন্ধু, সুরেশবাবুকে আমার অবস্থা জানাইয়া বলিবেন যে, তিনি যেন বন্ধুত্বের কথাটা বিস্মৃত না হন। ইতি।

চিরাপরাধিনী

আপনাদের লীলা"

চিঠিখানা পড়িয়াই নরেশ গর্ব্বিতভাবে বলিয়া উঠিল "কি হে! তুমি না বলিয়াছিলে, আমি নিশ্চয়ই ধরা পড়িব! এই দেখ, সবই বিপরীত হইতে চলিল।"

আমি স্বপক্ষ সমর্থন করিলাম, "হাঁ, যাহা বলিয়াছি, তাহার এক-বর্ণও মিথ্যা হইবার নহে! তুমি কি ধরা পড় নাই? নিশ্চয়ই পড়িয়াছ! তাহার "এক কৌশলে ধরা পড়া তো না, তুমি নিজেই ধরা দিয়াছ; আর এই এক কৌশলে তুমি আবদ্ধ হইবে।

চিঠিখানার শেষটা দেখিয়াছ?

হাঁ দেখিয়াছি।

"এই দেখ ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছে" বলিয়া নরেশ চিঠিখানা আমার হাতে দিল।

নরেশের অনুরোধরক্ষার্থে চিঠিখানা আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া আমি প্রতিবাদ করিলাম, "তাহার এ অনুরোধের উদ্দেশ্যও ঠিক তাহাই"।

তুমি যে কথা ধরিয়া বসিবে তাহা আর কিছুতেই ছাড়িবে না! তোমার সঙ্গে পাড়িয়া উঠি, আমার এমন শক্তি নাই" নরেশ এই বলিয়া বিরত হইতেই আমি উপহাস করিলাম "কাহার সঙ্গেই বা পারিয়া উঠ? অন্য তো দূরের কথা নিজের সঙ্গেই পার না! তোমার আবার আত্মগরিমা!"

তাহাতে নরেশ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল "তুমি যতই কেন বল না, এটা নিশ্চিত বলিয়া জানিবে যে আমার অন্তঃকরণ তোমার চেয়ে দুর্ব্বল নয়, ধৈর্য্যও তোমার চেয়ে কম নয়।"

আমি উত্তর করিলাম "হইতে পারে, বিষয়বিশেষে আমার

অন্তঃকরণ হইতে তোমার অন্তঃকরণ অনেক সবল, অনেক ধীর, কিন্তু এই অবলাদের কাছে সবল দুর্বল, ধীর অধীর সবি সমান।

নরেশ এবার আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল "তোমার এ ধারণা জন্মিতে পারে, কিন্তু আমার এখনও জন্মে নয়।"

তখন আমিও একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "তোমার একথা বিশ্বাস করিতে পারি, যদি এই চিঠির উত্তর না দিয়া পার,—উত্তর দিতে পারিবে না—লীলার সহিত দেখাও করিতে পারিবে না—আর তাহার বিষয় আলোচনাও করিতে পারিবে না।

সরস বালুস্তরের স্থায় অভিমান জিনিষটাও যতই ক্ষুণ্ণ হয়, ততই স্ফীত হইয়া উঠে,—ভিতরে কিছু থাক, আর না থাক বাহিরের আবরণটা ঠিকই রাখিতে চায়। তাই মনে মনে যাহাই থাক না, মুখে নরেশ প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল "হাঁ, আমি তাহাই করিব।"

"আচ্ছা দেখা যাইবে!" বলিয়া আমি সেই খানেই লীলার প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিলাম এবং আমার হস্তস্থ লীলার সেই চিঠিখানা আমার বাক্সেই পূরিয়া রাখিলাম। নরেশ কেবল বিঘূর্ণিত চক্ষে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। "সহিতেও পারে না, কহিতেও পারে না" তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমার মনে একটু দুঃখ হইল বটে; কিন্তু পরিণামের মজাটার লোভে আমি আর বিচলিত হইলাম না।

দিনের মনে দিন যাইতে লাগিল। নরেশের চোকে আর হাসি নাই; মুখে আর কথা নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম, আর ভাবিলাম "হায় রে পুরুষত্ব! এই তোমার বীরত্ব!।"

আমাদের পরস্পরের এইরূপ ভাব চলিতেছে, ইহার মধ্যে এক দিন বৈকাল বেলায় অকস্মাৎ রামচরণ আসিয়া উপস্থিত। আমি

তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে রামচরণ! খবর কি? সব ভাল তো?"

"হাঁ দাদাবাবু! সবি ভাল; তোমার বিবাহ! আজকার ট্রেণেই তোমাকে বাড়ী যাইতে হইবে।" এই কথা বলিয়া রামচরণ আমার হাতে একখানা চিঠি দিল।

আমি তাহার খবর শুনিয়াই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি তাহাকে একখানা বসিবার আসন দিয়া চিঠিখানা খুলিলাম। নরেশ তাহার ঐ অবস্থায়ও হাসিমুখে আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চিঠিখানা পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা পড়িয়া আমি বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম; নরেশ ব্যাকুলভাবে আমার দিকে একবার চাহিয়া, দূরে তাহার সিটে যাইয়া সরিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ কাহারো বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না; উভয়েই কঠিন সমস্যায় পড়িয়া গেলাম এবং ভাবিয়া তাহার কোনই সমাধান করিতে পারিলাম না।

পরে নরেশ বলিল, "চিঠিখানা আর একবার ভাল করিয়া পড় ত"। আমি নিঃশঙ্কভাবে আস্তে আস্তে পড়িলাম—

"সুরেশ! নদীয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চৌধুরীর প্রথমা কন্যা লীলার সহিত তোমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে; আগামী কল্য কন্যাপক্ষ হইতে পাকাদেখা দেখিতে আসিবে। সুতরাং বিলম্ব না করিয়া অদ্যই রাত্রির ট্রেণে তুমি রামচরণের সঙ্গে বাড়ী চলিয়া আসিবে; কিছুতেই ইহার অন্যথা করিবে না। অন্যান্য সংবাদ রামচরণের বাচনিক জানিবে। ইতি।

আশীঃ

শ্রীজগদীশ শর্ম্মণঃ

চিঠির পাঠ শেষ হইতে না হইতেই নরেশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আবারও বলিল "দেখি চিঠিখানা আমি একটু দেখি।" আমি নীরবে চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় তাহার আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কম্পিত হস্তে চিঠিখানা ধরিয়া নরেশ অনেক সময় বসিয়া পাঠ করিল; শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত উহা তাহার সামনেই ফেলিয়া রাখিল। পরে অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমার দিকে আর একবার তাকাইয়া, কি যেন বলিতে যাইয়াও বলিতে পারিল না;—অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম।

"তখন আর হাসপরিহাসের অবসর নাই;—প্রাণ খুলিয়া সকল কথা না বলিলে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না" দেখিয়া আমি বলিলাম "দেখ নরেশ! আমি তোমার বাল্যবন্ধু; আজ বিধিবিড়ম্বনায় প্রণয়প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মহাশত্রুতে পরিণত হইতে চলিয়াছি। এ ক্ষেত্রে আত্মগোপন করা আমার পক্ষেও সঙ্গত না, তোমার পক্ষেও সঙ্গত না। পাছে তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর, এই ভয়ে আমি আমার প্রাণ খুলিয়া দেখাইতেছি; তুমিও অক্ষুব্ধচিত্তে তোমার প্রাণ খুলিয়া দেখাও, যেন আমি সহজেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি। তোমার প্রাণে আঘাত দিলে আমি নিজেই অত্যন্ত ব্যথা পাই। হাসপরিহাসছলে মুখে যখন যাহাই বলিনা কেন কাজের বেলায় এ পর্য্যন্ত তোমার মনে কোন দিন কষ্ট দেই নাই দিতেও পারিব না; সুতরাং এখনই এ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিয়া রামচরণকে বিদায় দেই।"

আমাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া রামচরণ পূর্ব্বেই একটু বিস্মিত হইয়াছিল। পরে আমার কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বলিয়া উঠিল "সে কি? দাদাবাবু! আমার যে তোমাকে নিয়াই যাইতে হইবে! সব কথাবার্ত্তা ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে! কাল তাঁহারা পাকা দেখা দেখিতে আসিবে! এখন কি আর সম্বন্ধ ফিরান যায়? আর তোমার বিবাহ! নরেশবাবুর পক্ষে তো বিশেষ উৎসাহের বিষয়! তাহাতে তিনিই বা মনে কষ্ট পাইবেন কেন?"

আমি রামচরণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নরেশের উত্তরের অপেক্ষায় তাহার দিকেই চাহিয়াছিলাম। সে কোন কথা বলিতেছেনা দেখিয়া আবার বলিলাম, "নরেশ! এখন আর চুপ করিয়া থাকার অবসর নাই,—আমার পক্ষে আর কি কর্ত্তব্য হইতে পারে, তাহা তুমি বন্ধুভাবেই বলিয়া দাও।"

রামচরণ আবার বলিয়া উঠিল "তোমার পক্ষে আর কি কর্ত্তব্য হইতে পারে? দাদাবাবু! তুমি রাত্রির গাড়ীতেই আমার সঙ্গে বাড়ী যাইবে। না হইলে সে বড়ই অন্যায় হইবে। নরেশবাবু! আপনি বলিয়া দিন, দাদাবাবুর যেন বাড়ী যাওয়ার বাধা না হয়।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া রামচরণকে একটু রাগের সহিত বলিলাম "আরে! তুই থাম্ না! আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে আবার তুই কথা বলিতে আসিস্ কেন?"

রামচরণ তাহাতে আরও চটিয়া গিয়া বলিতে লাগিল "আমি কথা বলিতে আসিব না? তবে কে কথা বলিবে? আমি এতটুকুটী থেকে বুকে পিঠে করিয়া এত বড়টী করিয়াছি; এখন তুমি কিনা বাবামার অবাধ্য হইয়া তাহাদের মনে কষ্ট দিবে তাহাদিগকে

ভদ্রলোকের নিকট ব্যাকুব সাজাবে; আর আমি তথাপি চুপ করিয়া থাকিব! যে বাবামার কথায় গ্রামশুদ্ধ লোক এক পায় খাড়া হয়, ছেলে হইয়া তুমি যে তাহাদের কথা অগ্রাহ্য করিবে, তাহা কিছুতেই হইবে না;—আমি তোমাকে না নিয়া কিছুতেই বাড়ী যাইব না।”

আমি রামচরণের ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। নরেশ কোন কথার উত্তর করিবে না; আর রামচরণ তো কথা বলিতেই দিবে না। মাঝখানে পড়িয়া আমার এমন মুস্কিল হইল যে কিছু-ক্ষণের জন্য কাহাকে কি বলি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

তখন নরেশ আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল “না! সুরেশ! তোমার বাড়ী যাওয়াই কর্ত্তব্য।”

“আমিও তো তাই বলি, নরেশবাবু! বাপমায় অবাধ্য হইতে নাই।” বলিয়া রামচরণ তাহার কথা সমর্থন করিল।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম “দেখ নরেশ! তুমি কি বন্ধু ভাবেই এই কথা বলিয়া দিতেছ? আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপরাধ।”

নরেশকে অবসর না দিয়া রামচরণই তাহার উত্তর করিয়া বলিল “তোমার প্রকৃত বন্ধু যাহারা তাহারা সকলেই তোমাকে বাড়ী যাইতে বলিবে; আর তাহাতে অপরাধের বিষয়ই বা কি আছে?”

“আরে বিপদ! রামচরণ, তুমি একটু চুপ কর। তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা পরে বলিও; আমি নরেশের কাছে দুটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া নেই। না হইলে আমি আর তোমার সঙ্গে কোন কথাই বলিব না” বলিয়া আমি একটু বিরক্তির ভাবে

দেখাইতেই "আচ্ছা, আমি চুপ করিলাম। আমার যাহা বক্তব্য তাহা আমি বলিয়াছি, এখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার" বলিয়া রামচরণ রাগে রাগে নীচে নামিয়া গেল।

তখন আমি আবার নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কি তোমার প্রাণের কথা? এখন আর তুমি আত্মগোপন করিও না। তোমার যাহা বলিবার আছে, অক্ষুব্ধভাবে বলিয়া দাও, যেন আমিও তদনুসারে কাজ করিতে পারি। সরল প্রাণে আমিও যেমন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমিও তেমন সরল প্রাণেই সকল কথা খুলিয়া বল; তাহাতে তোমার ভীত বা সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ নাই।"

নরেশ যেন একেবারে নির্ব্বিকার সাজিয়া বসিল। বলিল "আমি তোমাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ জানিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে বন্ধুভাবেই বলিতেছি, এ সম্বন্ধ তোমার প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত না; তুমি রামচরণের সঙ্গে আজই চলিয়া যাও।"

আমি পুনরায় নরেশকে সাবধান করিলাম "দেখ নরেশ! মনে এক কথা মুখে আর এক কথা বলিতে গেলে, শেষে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হয়। আমি যতদূর জানি, তাহাতে লীলা যদি অন্যপাত্রস্থ হয়, তাহা হইলে তোমার প্রাণে যে আঘাত লাগিবে, যতই আত্মগোপন কর না কেন, তাহা তুমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং সময় থাকিতে তুমি যাহা হয় স্থির করিয়া বল। বাবা আমার উপরে সাময়িক অসন্তুষ্ট হইলে, তাহাতে বিশেষ একটা ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; আর যদি এই কারণে তোমার জীবনের গতি বিপরীত দিকে যায়, তাহা হইলে সে ক্ষতি আর পূরণ করার সম্ভব থাকিবে না।"

"আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার অন্তঃকরণ অত দুর্ব্বল নয়।

আমি অনেক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি এ সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি করা উচিত না। ধর, এ সম্বন্ধ যদি তোমার সহিত না হইয়া অন্য কাহারও সহিত স্থির হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি করিবার কি অধিকার থাকিত? অন্য পাত্রস্থ না হইয়া লীলা যে তোমার হাতে পড়িতেছে, আমার পক্ষে এটাও একটা শান্তির বিষয়;—ইহাতে তোমার সুখেই আমি সুখী হইতে পারিব। আর তুমি পিতার এক-মাত্র সন্তান; তিনি উৎসাহের সহিত তোমার বিবাহ দিতে যাইতেছেন চন্দ্রকান্তবাবুও তোমাকেই পছন্দ করিয়াছেন। এই অবস্থায় তুমি অস্বী-কৃত হইলে তোমার পিতা তো দুঃখিত হইবেনই, চন্দ্রকান্তবাবুও দুঃখিত হইবেন; সুতরাং তোমার পক্ষেও ইহাতে অস্বীকৃত হওয়া সঙ্গত না, আমার পক্ষেও কোন আপত্তি করা সঙ্গত না। একথা আমি অত্যন্ত সরল প্রাণেই বলিয়া দিতেছি; অন্যথা মনে করিও না।" বলিয়া নরেশ আত্মীয়ার বাড়ী যাওয়ার পক্ষেই মত প্রকাশ করিল।

এমন সময় রামচরণ 'বোর্ডিং'এর ঠাকুরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ধীর গম্ভীরভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। 'বোর্ডিং'এর মেম্বরদের মধ্যে সে বোধ হয়, ঠাকুরকেই সকলের চেয়ে মোটা ঠাহর করিয়াছিল; আর তাহা করিতেও পারে। একে ত স্বেচ্ছাহারবিহারে দিন দিনই ঠাকুর হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, তারপর বৈকালে সে যখন কোঁচা ঝুলাইয়া, গামছা কাঁধে করিয়া বাসা হইতে ফিরিয়া আসিত, তখন তাহার নিনাদে আমাদের "সঞ্জীবক পিঙ্গলকের" গল্প মনে পড়িলেও, ঝি [illegible] সব 'ত্রাহি মধুসূদন' বলিয়া ডাক ছাড়িত। সুতরাং রামচরণ যে তাহাকেই বড় কর্ত্তা মনে করিয়া, মধ্যস্থপদে বরণ করিয়া আনিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

ঠাকুর আসিয়া রামচরণের প্রদত্ত গৌরবটুকু রক্ষার্থে যেন একটু কর্ত্তৃত্বব্যঞ্জকস্বরেই জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল? আপনারা কি স্থির করিলেন?"

শুনিয়া রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলিতে লাগিল; —আমি তার কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। নরেশ অতি সহজ সরলভাবে বলিল, "না, সুরেশ রামচরণের সঙ্গেই যাইবে।"

শুনিয়া রামচরণ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল "বেশ কথা! যাহার বিবেচনা আছে, সে এইরূপই উপদেশ দিবে। কি? দাদা-বাবু! এখন আর ভাব কি? কর্ত্তব্য ত স্থির হইল?

আমি অনন্যোপায় হইয়া বলিলাম "হাঁ হইয়াছে।"

"তবে এখন বাড়ী যাওয়ার বন্দোবস্ত দেখ" রামচরণ এই বলিয়া তাড়া দিতেই "হাঁ, দেখিতেছি" বলিয়া আমি জিনিষ পত্র গুছাইতে লাগিলাম। রামচরণ আসিয়া আমার সাহায্য করিতে লাগিল। সব গুছান হইয়া গেলে আমি জামা কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইলাম এবং নরেশকে লক্ষ্য করিয়া "তবে এখন আসি" বলিয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:*:—

বিবাহের নামে অশীতিপর বৃদ্ধের দেহেও নাকি উৎসাহের সঞ্চার হয়,—সংসারের দুঃখ দৈন্য, উদ্বেগ চিন্তায় নিয়ত প্রপীড়িত স্তিমিত-প্রায় অন্তরও নাকি আশার নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া কত সুখস্বপ্ন দেখিতে থাকে। কিন্তু আমার সবই বিপরীত। যৌবনের অদম্য উৎসাহ, অসীম উচ্চাশা, অপরিসীম সুখকল্পনা সত্ত্বেও এমন উৎসবের নামে যেন কেমন বিকল হইয়া গেলাম। সুখময় সংসারে কেমন যেন একটা দুঃখের ছায়াপাত হইল। কিন্তু শক্ত পিয়াদা রামচরণ ছাড়িবার পাত্র নয়; অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থায়ই সে আমাকে তাড়াইয়া শিয়ালদহে নিয়া ট্রেণে তুলিল।

ট্রেণে উঠিয়া বাড়ীর কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রভার কথা মনে পড়ায় আর এক বিষম সমস্যায় পতিত হইলাম। আমি ত বিবাহ করিতে চলিয়াছি; নরেশ তাহার একান্ত অসম্মতি সত্ত্বেও অনুমতি দিয়া দিয়াছে। প্রভাও কি সেইরূপ করিতে পারিবে? না! প্রভা কেন! আমি নিজেই এ বিবাহে মত দিতে পারিব না! "সুতরাং এ বি-বা-হ-হ-ই-বে না"!

শেষে যাইয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহার্থ বাকী যাইয়া পৌঁছিতে হইল। রাত্রি ১০টার সময় ট্রেণ যাইয়া

আমাদের ষ্টেসনে পঁহুছিল ; অনন্যোপায় হইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম এবং "বাড়ী যাব না, যাব না" ভাবিতে ভাবিতে ১০॥০টার সময় যাইয়া বাড়ী পৌঁছিলাম।

আমাকে দেখিয়া বাবা অতিশয় উৎসাহিত হইলেন এবং সন্তোষ ভরে এক এক করিয়া আমাদের সব সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মা আমার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন ; তাঁহার মুখে একটু উদ্বেগের চিহ্ন লক্ষিত হইল। আর কেহই নিকটে আসিল না — প্রভাও না, রাধাও না।

মেধা যাহাদের কম, তাহাদের বুদ্ধিটা প্রায়শই একটু বেশী দেখা যায়! তাই চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিলাম, "ইহার ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে।" সেটা খুজিতে বড় দূরে যাইতে হইল না ;— আমার মধ্যেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এক খণ্ড কাল মেঘ যেন ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে এবং তাহার ফলে যাইয়া কি দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্যই যেন আমার অন্তরঙ্গ সকলে নীরব নিস্তব্ধ হইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অবস্থাটা দেখিয়া আমার ও একটু ভয় হইল। কিন্তু কি করি? যখন সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছি তখন আর পশ্চাৎপদ হইবার উপায় নাই, যে বিপদই উপস্থিত হউক না, তাহার সহিত বুঝিতে হইবে ; তাই গম্ভীরভাবে আহারাদি সমাপনান্তে নিজের ঘরে যাইয়া বসিয়া ভাবী বিপদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুকাল পরে দেখি রাধা আসিয়া উপস্থিত। তাহার সঙ্গে আরও যেন দু'একটা মৃদু পাদবিক্ষেপের শব্দ শুনিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু আর কেহ ঘরে প্রবেশ করিল না। রাধা আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণামেই

বলিয়া বসিল, "দাদাবাবুর দেখি বড্ড গরজ! বিবাহের কথাটা শুনিয়া আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সইল না! এত বড় ব্যাপারটা! যাহা লক্ষ কথা পূর্ণ না হইলে সম্পন্ন হয় না, তাহা তুমি সম্বন্ধ উত্থাপন করার পূর্ব্বেই সারিয়া ফেলিতে চাও?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে তুই কি বলিতে চাস্?"

সে উত্তর করিল, "আমি আর কি বলিব? আমার কথায় কি কোন কাজ হইবে? যদি হইত, তাহা হইলে এখনি কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া, কন্যাপক্ষকে বলিতাম, এখন আমার ছেলের বিবাহে মত নাই—বি, এ, পাশ করার পরে ভিন্ন সে বিবাহ করিবে না। যদি ততদিন অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই; না হইলে আপনারা অন্যত্র চেষ্টা করুন।"

আমি তর্ক তুলিলাম, "একথা আমাকে বলায় কি লাভ?"

"লাভ আছে বই কি; এই ধর, তোমাদের কি বোঝা উচিত নয়,—যাহাকে নিয়া চিরদিন ঘর সংসার করিতে হইবে, তাহার সহিত মোটেই দেখা সাক্ষাৎ নাই,—সে মানুষ; না ভূত; না আর কিছু, তাহা জানি না;—যাহার হাতে ধন, মান, মন, প্রাণ সবই সঁপিয়া দিতে হইবে, তাহাকে কোন বন জঙ্গল থেকে ধরিয়া নিয়া আসিবে—সে পোষ মানিবে, কি না মানিবে, তাহার ঠিক নাই; অথচ সমাজের আদেশ, তাহাকে তোমার বিবাহ করিতেই হইবে; এ কিরূপ ব্যবস্থা? আমাদের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই; অধিকার আছে কেবল গালাগালি খাইবার; কাজেই মনের আগুন মনেই চাপিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়।" বলিয়া বাধা নীরব হইল।

আমি কৌতূহলবশে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আবার কথা বলিস্ কেন?"

এবার রাধার যেন একটু রাগ হইল। সে হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "কথা বলিব না? শেষে তো আমারই ঠেকিতে হইবে! তুমি ত বিবাহ করিয়াই খালাস! সেটা ভূত হউক, আর পেতনী হউক, আমাকেই তাহাকে তাড়াইয়া বাজাইয়া ঘরের বৌটী তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে। তুমি চাহিবে তোমার মতন, মা চাহিবেন তাঁহার মতন, আর আমরা চাহিব মানুষের মতন। তাহাকে এই সকল রকম ছাঁচে ঢালিয়া আমাকেই মাজিয়া ঘসিয়া নিতে হইবে। এ সব কি কম ঝঞ্ঝাট? ইহা যাহার ভোগ করিতে হইবে, সে কথা বলিবে না তো, বলিবে কে?

আমি হাসিয়া কহিলাম, "তবে যতদূর পারিস্ বল।"

তাহাতে উৎসাহিত হইয়া সে বলিতে লাগিল, "এই যে মুসলমানদের মধ্যে নিয়ম আছে, "চাচা আপন, চাচী পর; চাচীর মেয়ে বিয়ে কর।" ওটা বেশ নিয়ম! এই ধর, ছোট বেলা হইতে যাহার এক চিন্তা এক ধ্যান, এক শান্তি এক প্রাণ, এক দুঃখ এক জ্ঞান, এক মান অপমান— তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাকার অজানা অচেনা একটাকে ধরিয়া আনা;—যাহাকে চির দিন আপনার বলিয়া মনে করিয়া আসা যায়, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পরের একটা মেয়েকে সাধিয়া ভজিয়া আপনার করিতে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? কোথা থেকে কে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, আর নিজেদের সোনারচাঁদ সব দয়া মায়া পরিত্যাগ করিয়া পরের হাতে সমর্পণ করিব—আর তা'রা নিয়া তাহাকে রাখিবে, না মারিবে তাহার ঠিক নাই, ইহা কি কম দুঃখের কথা!"

আমি অনেক কষ্টে হাসির বেগ সামলাইয়া বলিলাম — “তোর আর অত গৌরচন্দ্রিকার দরকার নাই! যাহা বলিতে চাস্, স্পষ্ট করিয়া বল না!”

রাধার প্রাণ যেন মুহূর্ত্তে খুলিয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিতে লাগিল, “বলিলে কি শুনিবে? তাহা হইলে তো তোমায় মাথায় করিয়া নাচিব—তোমাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব। তা' তোমার প্রাণ আছে, তুমি শুনিতেও পার। দেখ আমাদের প্রভা—আহা! আজ তাহার মুখের দিকে চাহিলে বুক ফাটিয়া যায়! সে দিবানিশি তোমার ধ্যান করে, তোমার মঙ্গলের জন্ত সর্ব্বদা ভগবানকে ডাকে। তাহাকে কি একেবারেই ভুলিয়া যাইবে? সে জন্মদুঃখিনী — ভগবান্ তাহাকে কোন কথা বলিবার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়াছেন; তাই হতভাগিনী অন্তরের কথা অন্তরেই রাখিয়া মুখে বলিতেছে, “তুমি বিবাহ কর, তাহাতে তাহার কোনই দুঃখ নাই; কিন্তু সে কিছুতেই কোথাও বিবাহ করিবে না—চিরদিন তোমার ঘরে দাসী হইয়া থাকিবে।”আচ্ছা, সেটা কি একটা সম্ভবপর কথা? তাহার ঐ রাজরাণীর চেহারা নিয়া সে দাসী হইয়া থাকিবে, আর কোথাকার কোন পেত্নী আসিয়া গিন্নী হইয়া বসিবেন, একথা ভাবিতেও আমার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠে। আজ দুই বৎসর যাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, সে পর হইয়া যাইবে; আর কবে কা'র সঙ্গে শুভদৃষ্টি হইবে, তিনি যে আসিয়া আপনার হইয়া বসিবেন, তাহা আমি ত দেখিতে পারিব না। যদি তাহাই কর, তবে আমাকে আগেই বিদায় দাও।”

এবার আমাকেও একটু নরম হইতে হইল। বলিলাম, “আচ্ছা

তুই ত যেন্ কন্যাকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিস্। আমি ত আর বরকর্ত্তা নয় যে এখনি তোর সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিব। যিনি বরকর্ত্তা তাঁহাকে, কি বরকর্ত্রী তোর গিন্নীমাকে, কি এ বিষয় কিছু বলিয়াছিস্?"

রাধা অত্যন্ত বিষন্নভাবে উত্তর করিল, "আর ও কথা তুলিও না, দাদাবাবু! এখন বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা সবই তুমি! তুমিই যাহা হয় কর। আসল বরকর্ত্তাকে বলিতে বলিতে আমি পাগল হইয়া গিয়াছি! গিন্নীমার মায়ার শরীর! তিনি আমার কথা শুনিয়া এবং প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া এক বাক্যেই তাঁহার মত দিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ত্তাবাবু কিছুতেই না; — তিনি প্রভার বিবাহে আরও ৩০০০৲ টাকা খরচ করিতে রাজি, তথাপি ঘরের মেয়ে ঘরে রাখিতে পারিবেন না।"

"তবে তো তোর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ" আমি এই কথা কহিতেই রাধা বলিয়া উঠিল, "ব্যর্থ কি? তোমার কাছে বলার কি কোন অর্থ নাই? একথা তুমি বলিও না। কর্ত্তাবাবু কি জোর করিয়া প্রভাকে কোথাও বিবাহ দিতে, কি তাহাকে কোন মতে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? সেও কিছুতেই বিবাহ করিবে না। তুমিও বলিয়া দাও, বি এ, পাশ না করিয়া বিবাহ করিবে না। তারপর দেখি, কোন উপায় হয় কিনা? না হইলে প্রভার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও যে অনাথা সেই অনাথাই হইতে হইবে।

আমি কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহা তুই যাহা বলিতেছিস্, তাহা ত শুনিলাম; এখন প্রভা কি বলে?"

রাধা একটু তিরস্কারের স্বরে জবাব দিল, "তুমি নিজে কি

কিছুই জান না—কিছুই বোঝ না? দাদাবাবু! প্রভা আর নূতন করিয়া কিছুই বলিবে না। যদি একান্তই বলিতে হয়, তবে মুখে নয়, যাহা বলিবার সে কাজেই বলিবে।"

আমার আর অধিক কিছু শুনিবার দরকার মনে করিলাম না। তখন রাধাকে আশ্বাস দিলাম, "তুই এখন যা। আমি সবই জানি—সবই বুঝি; তোর কাছে এ সব শুনিবার পূর্ব্বে আমার কর্ত্তব্যও স্থির করিয়া রাখিয়াছি। মোটের উপর আমার সাধ্যানুসারে এতদিন প্রভার দুঃখ দূর করিয়া আসিতেছি, এখনও করিবার চেষ্টা করিব; তবে ফলাফল ভগবানের হাত।"

"দাদাবাবু, তোমার মুখে এই কথাটা শুনিবার আশায়ই আসিয়াছিলাম। ভগবান্ তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে;—তুমি বিশ্রাম কর, আমি আসি" বলিয়া রাধা বাহির হইয়া গেল। আমি শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম :—

এইত সেই অকূল সাগর! প্রভা ত আমাকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বেই ঝাঁপ দিয়াছে এবং তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাহার ও আমার হৃদয়ে আঘাত করিতেছে! এখন আমি যদি সরিয়া যাই, তাহা হইলে আমি যেমন বিশ্বাসঘাতক হইয়া পড়িব, তেমন এই তরঙ্গাভিঘাতে প্রভার ক্ষুদ্র হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে! তাহা কি হইতে পারে? না! তাহা হইলে আমার হৃদয়ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে! প্রভা ছাড়া সংসার আমি দেখিতে পারিব না! যখন ভাসিতেই হইল, তখন প্রভাকে নিয়াই সংসারসাগরে ভাসিব;— যদি কূল পাই ত পাইলাম, না হইলে চিরদিনই ভাসিয়া বেড়াইব।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রিটা কাটিয়া গেল। সকাল বেলা

উঠিয়া আমার নিজের অবস্থায় নিজেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল, "স্বাধীনতার পুণ্যক্ষেত্র সেই স্বাবাস ভূমিতেই আমি যেন বন্দী হইয়া আছি — আত্মপরিচালনার অধিকার কি অবসর কিছুই নাই — ছুটিয়া পলাইবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও পলা-ইতে পারিতেছি না। আমার এই অবস্থায় রামচরণ আসিয়া বলিল "দাদাবাবু! তোমাকে দেখিতে আসিয়াছে; কর্ত্তাবাবু বলিয়া দিয়াছেন, তোমাকে এখনি বাহির বাড়ীতে যাইতে হইবে।"

আমি কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না; শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর ন্যায় সেই মুহূর্ত্তেই প্রহরী রামচরণের আদেশ প্রতিপালনার্থ নীরবে দণ্ডায়মান হইতেই দেখি "মা আমার কাপড় জামা হাতে করিয়া নিয়া আসিতেছেন।"

তিনি আসিয়াই বলিলেন "তুই কি এইভাবেই চলিয়াছিস্ নাকি? ভদ্রলোকের সামনে যাবি,—নে এই কাপড় জামা পরে নে। আমি অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলাম এবং রাম-চরণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া —যেন বিচারালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

সেখানে যাইয়া আমি যেরূপ সাদরসম্ভাষণে অভ্যর্থিত হইলাম, তাহাতে আমার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমি ত বন্দী নয়,— আমি যে নূতন বর! তখন নূতন বরের অকাল গাম্ভীর্য্যের সলজ্জ-ভঙ্গিমায় আমি যাইয়া পর পর চন্দ্রকান্তবাবু হরেনবাবু ও বাবাকে নমস্কার করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলাম। চন্দ্রকান্তবাবু সসম্ভ্রমে আমাদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন; আমিও অতি বিনীতভাবে যথাযথ উত্তর করিলাম। অনেক কথাবার্ত্তার পর শেষে চন্দ্রকান্তবাবু

আমাকে একটা আংটী দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—পরে বাবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তবে আপনি আমার পত্র পাইলে মেয়ে দেখিতে যাইবেন; তখন দেখিয়া শুনিয়া বিবাহের দিন স্থির করা যাইবে।" শেষে সেই কথাই স্থির হইল এবং ষোড়শোপচারে জলযোগ করিয়া চন্দ্রকান্তবাবু ও হরেনবাবু প্রস্থান করিলেন; আমিও যেন জামিনে মুক্ত হইলাম।

বিবাহ হউক, আর নাই হউক ভাবী বরের অভিনয়ে আমার কোথাও কোন ত্রুটি হইল না এবং সে দিনটা বাবা মার অতিরিক্ত আদর বিরক্তভাবে দেখিতেই দেখিতেই কাটিয়া গেল। আমার ভাগ্যে সম্পূর্ণটা ছিল না, কিন্তু যতটা ছিল তা'হারা বুঝিয়া নিলাম "অন্য সময় পারুক আর নাই পারুক জীবনের এই সময়টায় আমাদের সমাজে সকলেই বেশ একটু আত্মগৌরব অনুভব করিয়া থাকে"।

কিন্তু আমার পক্ষে সে গৌরবের গুরুভার বহন করা বড়ই কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তাই আর না পারিয়া সন্ধ্যার পরেই নিজের ঘরে যাইয়া বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার রাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। "খবর কি? রাধা", আমি হাসিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে উদাসভাবে উত্তর করিল "খবর আর কি? সর্ব্বত্রই প্রতারণা!"

আমি অন্তর্নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তুই এমন প্রতারণা কোথায় দেখিলি, যাহা একেবারে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল?"

রাধা ঠিক সেই ভাবেই জবাব দিল "তুমি যেন কিছুই জান না! এই ত তোমার আর এক প্রতারণা!"

আমি তর্ক তুলিলাম "তবে আমি পূর্ব্বেও একটা করিয়াছি; আর

এই একটা করিলাম,—সবে মাত্র দুইটা হইল! দেখ, আরও কটা করিতে হয়! তোদের পাল্লায় পড়িলে লোক কখনও খাঁটি হইয়া থাকিতে পারে না!"

এবার রাধার ক্ষুন্নাভিমান পূর্ণরূপে প্রকটিত হইল। সে বলিতে লাগিল "আর ত আবশ্যক নাই! এখন তুমি সম্পূর্ণ সাধু সাজিয়া বসিতে পার! প্রতারণা দুর্ব্বলের সর্ব্বস্বাপহরণের জন্য, তোমার সে কাজ পূর্ব্বেই সমাধা হইয়া গিয়াছে।"

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না; ভ্রূভঙ্গীতেই তাহার ব্যঙ্গ উড়াইয়া দিয়া বলিলাম, আচ্ছা, হইয়াছে,—তোর আর অত বক্তৃতা করিতে হইবে না! এখন কি জন্য আসিয়াছিস্ তাহাই বল।"

তখন রাধা একটু সোজা হইয়া কহিল, "আসিয়াছি—বিবাহটা কবে হইবে জানিয়া বিদায় নিবার জন্য।"

বিবাহ! কাহার?

তোমার! আর কাহার!

আমার বিবাহ!—যদি জীবনেই না হয়?

এ জীবনে আর বিদায়ও চাই না!

তবে যা! আর বিদায়ের আবশ্যকতা নাই! এখন যাইয়া নিজের কাজ দেখ।

"আচ্ছা, চলিলাম; আর যেন আমার কিছু বলিতে হয় না" বলিয়া রাধা প্রস্থান করিল। আমি বসিয়া আমার নিজের ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। তাহার কোন কূল কিনারা না পাইয়া শেষে "হৃষিকেশ হৃদি স্থিতং" বলিয়া সে দিনকার মতন নিশ্চিন্ত হইলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিবাহেরিতির সহিত জীবনের গতির একটা বিচিত্র সম্বন্ধ আছে,—সেটা আবার এক এক জনের পক্ষে এক একটু নূতন আকার ধারণ করিয়া বসে। কেহ তিরস্কার খাইয়া পুরস্কাররূপে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন; কেহ লাথি খাইয়া ব্যথা সারিতে কবিত্বের বিপুল উচ্ছ্বাস ছড়াইয়া দেন; কেহ বা টাকা খাইয়া ছাঁকা বিলাতী ব্যবহারজীবী হন; আর কেহবা মাটি খাইয়া শেষে খাঁটী হইয়া বসেন। আমি ইহার কোনটারই ভাগ পাইলাম না! শুধু ধাক্কা খাইয়া আত্মরক্ষার পথ দেখিতে হইল। তাই পরের দিন সকালেই কলিকাতা রওনা হইলাম। আরও দু'চার দিন বাড়ী থাকিলে বাবা মা ভালবাসিতেন; কিন্তু আমি পারছেন্‌টেজ যাইবার ভয় দেখাইলে তাঁহারা আর কোন আপত্তি করিলেন না। আর যে কাহারও আপত্তি করিবার বিষয় ছিল না, এমন নয়; যাহার ছিল, সে যেন প্রবলবেগে আকর্ষণ করিবার জন্যই আমাকে দূরে প্রেরণ করিল।

বাড়ীর বাহির হইতেই আমার মনটা অত্যন্ত অস্থির হইয়া যেন ভাবী কোন অমঙ্গলের সংবাদ দিল। ভাবিলাম, প্রভার অবস্থা তো দেখিয়াই আসিলাম; এখন নরেশ কি ভাবে আছে? তাহার মুখের কল্পনা সুন্দরী আমি কাড়িয়া লইয়া আসিয়াছি। সামরিক অভিযানের

বশবর্ত্তী হইয়া তখন সে তাহা উপেক্ষা করিয়াছে বটে ; কিন্তু এখনও কি স্থির থাকিতে পারিয়াছে ? যাহা হউক, কলিকাতা পৌছিয়া সবই জানিতে পারিব ; মনটাকে এইরূপে শান্ত করিয়া যথাসময় যাইয়া কলিকাতায় উপনীত হইলাম। তাড়াতাড়ি 'বোর্ডিং' এ যাইয়া দেখি "আর সকলেই উপস্থিত আছে ; কিন্তু নরেশ নাই! আমাদের ঘরের চাবিটা ঠাকুরের হাতে দিয়া পূর্ব্বদিন বৈকালে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে!"

কথাটা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং সে দিন নরেশের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বাড়ী যাওয়াটা সঙ্গত হয় নাই, বুঝিয়া বড়ই অনুতাপ হইল। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম ; পরে ঠাকুরের নিকট হইতে চাবিটা লইয়া ঘর খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখি, আমার বিছানার উপর একখানা চিঠি পড়িয়া আছে। চিঠিখানা ধরিয়া দেখি নরেশেরই লেখা ; তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িলাম ;—

ভাই সুরেশ, যে অজ্ঞাত শক্তির নির্দেশে গত পরশ্ব আমি সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে তোমাকে বন্ধুজনোচিত উপদেশ দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছি, সেই অজ্ঞাত শক্তির আদেশেই আজ আমি তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কোন উদ্দেশ্যে কোথায় চলিয়াছি জানি না ; কিন্তু আমার আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিবার শক্তি নাই। আবার যদি কোন দিন সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে সবই জানিতে পারিবে। ইতি

হতভাগ্য
নরেশ।

চিঠিখানা পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে দিনকার ঔদাসীন্যের ফলে একটা কিছু যে ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম; কিন্তু নরেশ যে এত শীঘ্র একেবারে বিদায় গ্রহণ করিবে, এতটা আমার ধারণা ছিল না। যাহারা যত লঘু ভাবে, সাংসারিক বিষয় তাহাদের নিকট ততই গুরুতর হইয়া পড়ে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যে গণনা নরেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহা আজ বর্ণে বর্ণে সত্যতায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই তো সেই বিরহ! এখন বিবাহের কথাটা সত্যতায় পরিণত হইলে হয়! মনে মনে ভাবিলাম, যিনি প্রণয়প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি তাঁহার পুরুষোচিত বীরত্ব ত এই দেখাইলেন, যিনি প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বিনী, তিনি তাঁহার স্ত্রীজনোচিত ভীরুতা নিয়া আবার কি করিয়া বসেন! তিনি ত স্বাধীনা নন, যে নরেশের ন্যায় বিদায় গ্রহণ করিবেন; যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে তাহার চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। উভয় দিকেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপরে! ভগবান্ আমাকে কেন এ বিপদে ফেলিলেন?"

যাহা হউক, আগতন্তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতং" এই উপদেশ বাক্যানুসারে তখনই হরেন বাবুর নিকট যাইয়া সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলাম,— প্রথমদর্শনাবধি নরেশ ও লীলার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, ঘুড়ীখেলাসম্পর্কে তাহাদের মনোভাবের আদান প্রদান, এবং আমার সহিত লীলার বিবাহ সম্বন্ধে নরেশের যে ভাবে সম্মতি প্রদান—শেষে তাহারি ফলে বিদায় গ্রহণ। পরে প্রমাণস্বরূপ লীলার ও নরেশের চিঠি দুখানা তাহার হাতে দিলাম।

প্রথমে লীলার চিঠিখানা পড়িয়া হরেনবাবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীকৃষ্ণ কি একাকী পলাইয়াছেন, না রুক্মিণীকেও সঙ্গে নিয়া গিয়াছেন?"

আমিও হাসিয়া উত্তর করিলাম, "এ শিশুপালের হাতে পড়িয়া এবার একাকীই পলাইতে হইয়াছে।"

শুনিয়া হরেনবাবু ব্যঙ্গ করিলেন, "তাহা হইলে রুক্মিণীর ত বড়ই বিপদ উপস্থিত!"

"সেরূপ গুরুতর কিছুর আশঙ্কা করিবেন না; — শিশুপাল অন্যানুরক্তাকে স্পর্শও করিবে না।" আমি এই অভিমত প্রকাশ করিতেই তিনি অনুযোগ দিলেন, "তবে জানিয়া শুনিয়া তাঁহার এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হওয়া কি সঙ্গত হইয়াছে?"

"সেটা তাঁহাকে ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, সে বিচার পরে করিবেন বলিতেই "হাঁ! হাঁ! আগে ঘটনাটা বুঝিয়া নিই" বলিয়া হরেনবাবু নরেশের চিঠিখানাও পড়িয়া শেষ করিলেন। পরে একটু চিন্তিতভাবেই বলিলেন, "তাই ত, এখন তা'র উপায়?"

"উদ্বন্ধনং বা বিষভক্ষণং বা! নিন আপনার ও সব ভাবের কথা ছাড়িয়া দিন,—এখন কাজের কথা বলুন"বলিয়া একটু বাধা দিতেই হরেনবাবুর যেন আরও ভাব লাগিয়া গেল। তাহাতে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা! কি ভাব! কি ভাব! অনু-রা-গে বৈ-রা-গ্য!"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলাম, "কি জালা! এখন রসরঙ্গের সময় নয়, — কি কর্ত্তব্য তাহাই স্থির করুন।"

হরেনবাবু উত্তর করিলেন, "আপনারা রঙ্গ করিতে পারিবেন,

আর এত বড় কুটুম্ব হইয়া সে রসটার একটু ভাগও কি আমাকে দিবেন না? এত বড় অন্যায় কথা!"

আমি পরাস্ত হইয়া কহিলাম, "বেশ নিন, তবে বর্ত্তমান অবস্থায় একটা কিছু কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিন, আপনার ত রসাস্বাদের সময় ফুরাইয়া যাইতেছে না! কিন্তু আফিসের বেলা যে বাড়িয়া চলিল।"

হরেনবাবু যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "না! এ শালাদের যন্ত্রণায় একটু যে হাঁফ ছাড়িয়া বাচিব তাহাও দিবে না;— কেবল কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য! আরে! কর্ত্তব্য আর কি? — কর্ত্তব্যো-মহদাশ্রয়ঃ! চল, পুলিশের আশ্রয় নেওয়া যা'ক!"

বলিতে বলিতে তিনি জামা জুতা পরিয়া বাহির হইলেন; আমিও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম। আমরা যাইয়া পুলিশে সংবাদ দিতেই তাহারা আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ সেলামী ও ফিসের টাকা চাহিয়া নিল। পরে নরেশের চেহারা, পরিচয় প্রভৃতি লিখিয়া নিয়া প্রত্যেক থানায় টেলিগ্রাম করিল। তখন সেখানে বসিয়াই এক চিঠিতে শ্যামাচরণ বাবুকে সকল সংবাদ জানাইয়া আমরা হরেনবাবুদের 'বোর্ডিং'এ ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে অনেক কথাবার্ত্তার পর — অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, আমি চন্দ্রকান্তবাবুর প্রদত্ত সেই আংটীটা হরেনবাবুর নিকট প্রত্যর্পণ করিলাম এবং অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তমনে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরের দিন বৈকালবেলা শ্যামাচরণবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি নরেশের চিঠিখানা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, "আমি বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিছানার উপরে এই চিঠিখানা আর

পাইয়াছি; তার পর আজ দু'দিন আর কোন খোঁজখবর পাই নাই।"

শ্যামাচরণবাবু নিবিষ্টচিত্তে চিঠিখানা পড়িয়া কিছুকাল মুহ্যমান অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। আমি আবার বলিলাম, "কাল ঐ চিঠিখানা পাইয়া, সেই সময়ই আমি হরেনবাবুর নিকট যাইয়া সংবাদ দেই; পরে দু'জনে মিলিয়া কালকেই পুলিশে সংবাদ দিয়া আসিয়াছি।

শ্যামাচরণবাবু সে কথা শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। চিঠিখানা দেখাইয়া বলিলেন, "আমি ত ইহার কোন ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না; বল ত সুরেশ, ইহার মধ্যে আর কোন রহস্য আছে কিনা?"

আমি তাঁহার নিকট সে রহস্য উদ্ঘাটন করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তুমি তাহাতে কোনরূপ লজ্জা কি সঙ্কোচ বোধ করিও না,—সব ঘটনা পরিষ্কার করিয়া বল, যেন আমি অবস্থাটা ঠিক বুঝিয়া নিতে পারি।"

তাহাতে সাহস পাইয়া আমি লীলার সম্পর্কে আমূল বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বিবৃত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় চন্দ্রকান্তবাবুর সহিত হরেনবাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে বসিতে দিয়া বিনীতভাবে সরিয়া দাঁড়াইলাম। প্রণামান্তে হরেনবাবু শ্যামাচরণবাবুর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন; পরে তাঁহার সহিত চন্দ্রকান্তবাবুর পরিচয় করাইয়া দিলেন।

তখন চন্দ্রকান্তবাবু শ্যামাচরণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়ের সংবাদ হরেনবাবুর নিকট শুনিয়াছি;—আপনার ছেলেটি ত আপনাকে বড়ই উদ্বেগের মধ্যে ফেলিয়াছে।"

শ্যামাচরণবাবু প্রকাশ করিলেন, "হাঁ! মহাশয়, বড়ই উদ্বেগের মধ্যে ফেলিয়াছে। সেই কথাই ত সুরেশের সঙ্গে হইতেছিল, শুনুন, সুরেশের মুখেই সব শুনিতে পারিবেন। বল সুরেশ! যাহা বলিতে-ছিলে—প্রথমাবধিই আবার বল।"

আমি আবার নরেশ ও লীলার সম্পর্কে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত করিয়া বলিলাম! শেষে আস্তে আস্তে প্রমাণস্বরূপ লীলার চিঠিখানাও তাঁহা-দের সমক্ষে রক্ষা করিলাম।

শ্যামাচরণবাবু সে চিঠিখানা ধরিয়া পড়িলেন। পরে নরেশের ও লীলার সেই চিঠি দু'খানা চন্দ্রকান্তবাবুর হাতে দিলেন। তিনিও অনেক সময় ধরিয়া পড়িলেন; শেষে চিঠি দু'খানা বিছানার উপরে রাখিয়া শ্যামাচরণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ দেখিলাম বটে; কিন্তু আমাদের পক্ষে এ সকল বুঝাই ভার।"

শুনিয়া শ্যামাচরণবাবু সমালোচনা আরম্ভ করিলেন, "হাঁ! দেখুন, আজকাল-কার ছেলেমেয়েদের ধরণই যেন অন্যরকমের। তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চ ইংরাজীশিক্ষার ফলে সব বিষয়েই একটু উচ্চতর ভাব পোষণ করিয়া থাকেন এবং আদর্শচরিত্রগঠনার্থ নভেলনাটকের চরিত্র খুঁজিয়া বেড়ান। ফলে নিজেদের চরিত্রটা না সামাজিক, না কাল্পনিক—এক অদ্ভুত রকমের করিয়া গড়াইয়া তোলেন; আর এই জাতীয় এক একটা অকাণ্ড ঘটাইয়া, আমাদের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিয়া স্বসমাজে ধন্যবাদার্হ হন। এদের আচ্ছা করিয়া চাবুক মারিলে শিক্ষার উপযুক্ত পুরস্কার বিধান হয়!"

শ্যামাচরণবাবুর ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার তখন ভয় হইল, পাছে আমাকে দিয়াই প্রথম আরম্ভ করেন। ভগবানের ইচ্ছায় চন্দ্রকান্তবাবু

সে ভয় হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি যেই বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ! ঠিক বলিয়াছেন, অমনি শ্যামাচরণবাবুর মুখখানা যেন একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া আমি কতকটা আশ্বস্ত হইলাম বটে, কিন্তু চন্দ্রকান্তবাবু আবার কি বলেন, ভাবিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইলাম।

তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "প্রায়শই ছেলেমেয়েদের ঐরূপ ভাবটা দেখা যায়;—তাহারা সর্ব্বত্রই সরলতা, পবিত্রতা, আন্তরিকতা প্রভৃতি দেখাইতে যায়; অথচ যে অন্তরের এই সব বৃত্তি তাহার অসম্পূর্ণতার বিষয় মোটেই চিন্তা করে না।"

শ্যামাচরণবাবু তাহার উপর একটু শ্লেষ চড়াইলেন, হাঁ; মহাশয়! তাঁহাদের অন্তঃকরণ এতই সরল, এতই কোমল, যে কথায় কথায় সুখ দুঃখের উচ্ছ্বাস আসিয়া পড়ে। বালকবালিকাদের যেমন বলা, "আজ পিঠা সন্দেশ করিয়া তোকে দিব; আর তুই যত পারিস্ টপ্ টপ করিয়া খাবি। অমনি তাহারা পিঠা সন্দেশের মধুর রস আস্বাদন করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে হাসিতে হাসিতে কি যে বলিবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। আর যদি কেহ বলে, "পিঠে সন্দেশ সবই করা হইবে, কিন্তু তোকে মোটেই দেওয়া হইবে না।" অমনি পিঠাসন্দেশের শোকোচ্ছ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে হয়ত সে রাগ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিবে, আর না হয় নিতান্ত বিরূপ হইয়া কিরূপে প্রতিশোধ নিবে তাহার জল্পনা কল্পনা করিতে থাকিবে। আজকালকার ছেলেমেয়েদেরও ঠিক সেই অবস্থা! যেই কল্পনা তাঁহাদের মনোমোহিনী মনোমোহনকে আনিয়া দিবে, এইরূপ আশা দেয় অমনি প্রেমরসে বিহ্বল হইয়া তাঁহারা যে কি করিবেন; তাহা ঠিক

পাম না। আর যেই ঘটনা বলে "না, তোমাকে সে সব কিছুই দেওয়া হইবে না, অমনি বিরহোচ্ছ্বাসে মর্ম্মাহত হইয়া হয় ত বৈরাগ্যই অবলম্বন করিতে যান; আর না হইলে প্রতিশোধ নিবার জন্য জল্পনা কল্পনা করিতে থাকেন।"

যদিও আমার মনে মনে বেশ একটু অভিমানেরই সঞ্চার হইতেছিল, তথাপি শ্যামাচরণবাবুর একথা শুনিয়া আমিও একটু না হাসিয়া পারিলাম না। সে হাসির বেগটা থামিতে না থামিতে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "শুধু তাহা নয়; মহাশয়! আরও কত বিশেষত্ব আছে। তাঁহারা দু'পাতা ইংরাজী পড়িয়া মনে করেন, যে ইংরাজজাতির বুদ্ধিবিদ্যা, সহিষ্ণুতা, পরিণাম-দর্শিতা ও স্বাধীনচিন্তার অধিকারী হইয়াছেন এবং মুখে ব্যক্ত করেন যে, তাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন। তখন এই অধঃপতিত বাঙ্গালীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না,—পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে নিতান্ত অশিক্ষিত কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া কর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিতে চান না। অথচ তাঁহাদের সেই শিক্ষার, সেই গুণাবলীর এত গৌরব যে গুরুজনেরা হাল ছাড়িয়া দিলে, সংসারসাগরের তীরে বসিয়াই হাবুডাবু খাইতে থাকেন।

চন্দ্রকান্তবাবু সমর্থন করিলেন, "এই সব উচ্ছৃঙ্খলতাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন! এই যে হঠাৎ বৈরাগ্য! ইহার মূল্য যে কতটা তাহা আমরা বেশ বুঝি। সংসার-সুখের প্রলোভনটা সোজা নয়! সুখ-দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে যাহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সুখ-শান্তির আশায় যাহারা দিন দিন অশান্তি জড়াইয়া পদে পদে সংসারের অসারতা অনুভব করিতেছে, তাহারাও ইহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না,—আর এই সব বালক, যাহারা সাংসারিক সুখের প্রবল

আকাঙ্ক্ষায় নিয়ত পরিচালিত—যাহাদের নিকট প্রলোভন নিত্য নূতন আকারে উপস্থিত হইতেছে, তাহাদের পক্ষে সংসার পরিত্যাগ করিতে যাওয়াটা যে কি প্রহসন তাহা অতিসহজেই অনুমিত হইতে পারে।”

শ্যামাচরণবাবু টীপ্পনী করিলেন, “হাঁ! ওটা যে এক প্রহসন বিশেষ, তার পরিচয় পাইতে বড় বিলম্ব হয় না; তবে ওটাকে ঠিক বৈরাগ্য না বলিয়া বরং আনুরাগ্য বলাই যুক্তিসঙ্গত; কারণ ওটা অনুরাগের বিশিষ্ট ভাব বলিয়াই আজকাল পরিগণিত।”

চন্দ্রকান্তবাবু সমর্থন করিলেন, “হাঁ সে কথা ঠিক। যদি পরীক্ষার্থ কিছুদিন স্থির হইয়া থাকা যায, তাহা হইলে তাহাদের আবার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না; তথাপি পিতা মাতার মন শান্ত থাকিতে পারে না;—সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয় “আবার গিয়া কোন নূতন বিপদে পড়ে।” একবার ভুল করিলে লোকে পর পর ভুল করিতে থাকে; সুতরাং তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না,—তাহাদিগকে ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হয়!”

তখন শ্যামাচরণবাবুর সমালোচনা যেন শেষ হইল। তাই তিনি একটু উদাসভাবে বলিয়া উঠিলেন, “এখন সবই আশ্চর্য্য!”

শুনিয়া চন্দ্রকান্তবাবু একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন “আপনি এ ঘটনার সম্পূর্ণ রহস্য এখনও জানিতে পারেন নাই। জানিলে বুঝিতে পারিবেন আপনি যেমন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন আমিও তেমনিই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি।”

শ্যামাচরণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “সে আবার কি? আপনার লীলাও কি সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়াছে নাকি?”

চন্দ্রকান্তবাবু উত্তর করিলেন "না-না, ততটা আর পারিয়া উঠে নাই! তবে সুরেশ বুঝি আবার নরেশের অনুসরণ করিতে চায়।"

শ্যামাচরণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি রকম?"

"আচ্ছা সুরেশের নিকটেই জিজ্ঞাসা করা যাক" এই বলিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা সুরেশ, তুমি কাল হরেনবাবুর নিকট কি বলিয়াছ, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই; বিবাহ সম্বন্ধে তুমি নাকি কিরূপ অনভিপ্রায়ের কথা জানাইয়াছ?"

পূর্ব্বে আমাদের সাধারণের উপর দিয়া যত আক্রমণ চলিয়াছিল, তাহা একরূপ সামলাইয়া ছিলাম। এবার সবই একা আমার ঘাড়ে আসিয়া চাপিতেছে দেখিয়া মনে হইল "আজ আর আমার উদ্ধার নাই! যদি সদুত্তর না দেই, তাহা হইলে চাবুকের চোটে ত পিঠের চামড়াই থাকিবে না; সদুত্তর দিলেও দুইএক ঘা খাইতে হইবে; সুতরাং উত্তরের ভারটা হরেনবাবুর উপরে দেওয়া যায় কিনা, এই জন্য বলিলাম, "আমি ত সকল কথাই হরেনবাবুর নিকট খুলিয়া বলিয়াছি, তাহা আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিয়া লজ্জা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।"

কিন্তু তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নন, আর আমাকে যে ভাবে পাকড়াইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে সহজে ছাড়াও সঙ্গত না; তাই হরেনবাবুকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই চন্দ্রকান্তবাবু আবার বলিলেন, "তা তোমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তোমার মুখে স্পষ্টতঃ শুনাই একান্ত প্রয়োজন।"

তখন আমি দেখিলাম যে স্পষ্ট কথা না বলিলে হয় ত আরও বেশী দোষের ভাগী হইতে হইবে; সুতরাং অতি বিনীতভাবে বলিলাম, "আপনি লীলার সম্বন্ধ অন্যত্র খুঁজুন; আমি তাহাকে বিবাহ করিব না।"

তাহাতে চন্দ্রকান্তবাবু অনুযোগ দিলেন "তুমি এ কথা আজ কেন বলিতেছ ?"

পূর্ব্বেই আমার এ কথা বলা সঙ্গত ছিল ; কি করি, আপনাদের ভয়েই তখন বলিতে পারি নাই ; এখন আর না বলিলে চলে না বলিয়াই বলিলাম " অবনতমস্তকে আমি এই কথা কহিতেই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন " এ কথা এখন কেন বলিতেছ ? ইহার কারণ কি ?"

"অবশ্য লীলার কোন দোষ নাই , বরং সে যাহার হাতে পড়িবে তাহাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। তবে আমি যে কারণে অস্বীকার করিতেছি , তাহা আমি বলিতে ইচ্ছুক নহি। আপনাদের পায়ে পড়ি ; সে জন্য আমাকে আর পীড়াপীড়ি করিবেন না " বলিয়া আমি নীরব হইলাম।

তখন চন্দ্রকান্তবাবু শ্যামাচরণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "শুনিলেন ত সব ; ভাবিয়া দেখুন , আমিও কতদূর বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। এখন আমাকেই বা কি উপদেশ দেন ?"

শ্যামাচরণবাবু কহিলেন "আপনার যখন কন্যাদায় , তখন একবারের কাজ দশবার জিজ্ঞাসা করায়ই বা দোষ কি ? আপনি জগদীশবাবুর নিকট আর একবার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। "

মাঝখানে হরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন "বিবাহ সম্বন্ধে যাহা হয়, পরে স্থির করা যাইবে। এখন নরেশের অনুসন্ধানার্থ কি করা সঙ্গত তাহাই স্থির করুন।"

শ্যামাচরণবাবুর পূর্ব্বের ভাবটা যেন তাহাতে আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন "যখন বাহির হইয়াছে, তখন কিছুদিন ঘুরিয়া আসুক না ! আবার একটা অনুসন্ধানের দরকার কি ? উহাতে

আরও খারাপ হয়—ক্রমেই মান বাড়িতে থাকে! তার চেয়ে কিছু দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া একটু শিক্ষা পাইয়া আসুক!"

শ্যামাচরণবাবুর ভাব দেখিয়া হরেনবাবু আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব হইয়া রহিলেন। পরে চন্দ্রকান্তবাবু বলিলেন "চলুন, আপনারা দু'জনে আজ আমার বাসায় আহারাদি করিবেন।"

শুনিয়া শ্যামাচরণবাবু আপত্তি করিলেন "সেটা কি রকম হয়!"

চন্দ্রকান্তবাবু প্রতিবাদ করিলেন "না! তাহাতে কোনই লজ্জার কারণ নাই! হরেনবাবুর সম্পর্কেই আমি আপনার সহিত বিশেষ সম্পর্কিত মনে করিবেন।"

তখন চন্দ্রকান্তবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। যাইবার সময় শ্যামাচরণবাবু আমাকে বলিয়া গেলেন "দেখ সুরেশ! এখন পর্য্যন্ত তোমাদের বুদ্ধির পরিপক্কতা জন্মে নাই। তাই সকলেরই একটু 'উড়ো উড়ো' ভাব আছে। তোমাকে সাবধান করিয়া যাইতেছি, তুমি আবার নরেশের অনুসন্ধানে বাহির হইও না।"

আমি তাঁহার কথার উত্তর না করিয়া মনে মনে ভাবিলাম "আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝিব; যাক, সে পরের কথা, এখন আপনারা সরিলে একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাচিতে পারি!"

ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহারা সে যাত্রার মত আমাকে উপেক্ষা করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িলেন। লীলা ও নরেশের চিঠি দুখানা বিছানার উপরেই পড়িয়াছিল, আমি তাড়াতাড়ি উহা বাক্সের ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিলাম। পর মুহূর্ত্তেই চন্দ্রকান্তবাবু ফিরিয়া আসিয়া

লিলেন "লীলার চিঠিখান। এই খানেই বোধ হয় ফেলিয়া গিয়াছি; সে খানা কি হইল?"

"তাহা'ত ঠিক বলিতে পারিলাম না! আপনার হাতেই ত ছিল না?" বলিয়া আমিও চন্দ্রকান্তবাবুর সঙ্গে চিঠিখানার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হারাণ জিনিষ সহজেই মিলিতে পারে, কিন্তু লুকানটা মেলা বড়ই শক্ত কথা; তাই সে চিঠিখানা অনেক খুজিয়াও পাওয়া গেল না। শেষে একটু অসন্তুষ্ট ভাবে "না, আর দরকার নাই" বলিয়া চন্দ্রকান্তবাবু প্রস্থান করিলেন। অমি যেন এক মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

—:*:—

দিনের মনে দিন যাইতে লাগিল; কিন্তু নরেশ আর ফিরিল না! তাহার সঙ্গে আমার পূর্ব্বের সে উৎসাহ উদ্যম, আমোদ প্রমোদ, সুখ-শান্তি, আশা-ভরসা—সবই অন্তর্হিত হইল; কিছুই আর ফিরিল না। তখন সঙ্গিবিহীন পথিকের ন্যায়, শ্রোতৃবিহীন বক্তার ন্যায়, সমালোচক-বিহীন ভাবুকের ন্যায়, স্বরযন্ত্রবিহীন গায়কের ন্যায়, আমি প্রায়শই আকাঙ্ক্ষিতের আসার আশায় বসিয়া থাকিতাম;—কোথাও না যাইয়া পারিলে আর যাইতাম না; কথা না কহিয়া পারিলে আর কহিতাম না; মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া পারিলে, আর করিতাম না এবং আমার এই দুঃখের কাহিনী কোথাও না গাহিয়া পারিলে, আর গাহিতাম না। কলেজে যাইতাম বটে, কিন্তু শূন্যঘরে একাকী থাকিতে পারিতাম না বলিয়াই যাইতাম। ফিরিবার সময় মনে হইত "যাইয়া বুঝি নরেশকে দেখিতে পাইব।" সে আশায় নিরাশ হইয়া প্রত্যেক দিন ছাদের উপরে গিয়া বসিতাম এবং রাস্তার সেই অবিচ্ছিন্ন জনস্রোতের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তখন দূরের লোক দেখিলেই মনে হইত "ঐ বুঝি নরেশ আসে।" সে নিকটে আসিতেই আমার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত আবার দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতাম। এই ভাবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত; শেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িতাম, পড়া শুনা আর কিছুই করিতে ইচ্ছা হইত না।

শিক্ষার বিশালক্ষেত্র এই জগৎ সংসারে মানুষ মাত্রেই দৃষ্টপরি-কল্পনার সাহায্যে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের জ্ঞানলাভ করিতে চায়। আমিও সকল অবস্থাতেই তাহাই করিতে চাহিতাম। তাই এই নিদারুণ বন্ধুবিরহের অবস্থায় কোন সময়ে ভাবিতাম, "দৈববিড়ম্বনায় এবার বন্ধুবিরহ যে কি জিনিষ, তাহা ত বেশ ভাল করিয়াই বুঝিলাম। স্ত্রীবিরহটাও ত একটা বিরহবিশেষ; তবে সেটা কিরূপ? আর তাহার প্রভাবেই বা লোকের কিরূপ অবস্থা হইতে পারে?"

অমনি দৃষ্টপরিকল্পনা আসিয়া বুঝাইয়া দিত "যাহার সহিত যতটা মিলনসুখ, তাহার বিচ্ছেদে ততটা বিরহযন্ত্রণা।" তাহা হইলে স্ত্রীর সহিত যতটা মিলনসুখ, ততটা ত কোথাও শুনা যায় না; কাজেই স্ত্রীবিরহটা বন্ধুবিরহ কেন, সকল বিরহের চেয়েই বড়; আর তাহার প্রভাবে লোকের অবস্থা ইহা হইতেও বেশী শোচনীয় হইবারই কথা। অনেক চিন্তার ফলে শেষে যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতাম, তখন ভয় হইত যে, যদি বিবাহ করি, তাহা হইলে ত সে স্ত্রীবিরহ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না; সুতরাং বিবাহ না করাই যুক্তিসঙ্গত।

আবার কোন সময় ভাবিতাম, "বিরহও বিচ্ছেদ, মরণও বিচ্ছেদ। তবে উভয়ের পার্থক্য কি?" তখনি দৃষ্টপরিকল্পনা আসিয়া আবার বুঝাইয়া দিত, "বিরহ ও মরণ দুইটাই বিচ্ছেদ বটে; কিন্তু প্রথমটা সংযোগানুকূলব্যাপার, আর দ্বিতীয়টা বিয়োগানুকূলব্যাপার; প্রথমটার প্রভাবে অস্তিত্ব কিছু থাকে, আর দ্বিতীয়টার প্রভাবে অস্তিত্ব মোটেই থাকেনা; আর প্রথমটায় "উপোষিতাভ্যাম্ ইব লোচনাভ্যাম্" হইয়া

থাকিতে হয়, আর দ্বিতীয়টায় 'নিমীলিতাভ্যাং খলু লোচনাভ্যাম্' হইয়া থাকিতে হয়। তখন দ্বিতীয়টার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া এতই ভীত হইয়া পড়িতাম যে প্রথমটাকেও পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রাজননীর ক্রোড়ে যাইয়া আশ্রয় নিতাম।

এই ভাবে দিন কাটিতে কাটিতে পূজার বন্ধ আসিয়া পড়িল তখন আবার ভাবিলাম "এবার বাড়ী যাই কিনা?" এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অন্য কেহ নাই দেখিয়া আমি নিজে নিজেই বিচারণা আরম্ভ করিলাম :—

"বাবার কৃত বিবাহসম্বন্ধের বিশিষ্টভাবে ব্যাঘাত করিয়া আবার যে বাবার বাড়ী যাব, বাবা! তারপর বাবা যদি বাহির করিয়া দেয়, তবে বাবার বাবাও ত বাধা দিতে পারিবে না! আর যদি বাড়ী নাই বা যাই তবু ত বিরহ, বাবা! বিপুল বৈরিবাহিনীর ন্যায় প্রবলবেগে দুই দিক হইতে আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। তখন আমার উপায়! হয় এদিক, না হয় ওদিকের আশ্রয় না নিলে আমার আমিত্বকেই যে বিলুপ্ত করিবে! তাহা কি হইতে পারে? না! আমার আমিত্ব হারাইয়া বন্ধের সময় বিদেশে থাকা বিবেকবিরুদ্ধ!" সুতরাং বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও বাড়ী যাওয়া সুস্থির হইল এবং কলেজ বন্ধ হইবার দুই দিন পূর্ব্বেই বাড়ী রওনা হইলাম।—আপনারা কেহ হাসিবেন না! এইরূপ অবস্থায় সকলেই সেইরূপ করিয়া থাকেন।

আমি ত বাড়ী গেলাম! মা আসিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমিও তাহার উত্তর দিতে লাগিলাম; কিন্তু বাবা যেন কেমন একটা বিচিকিৎসা ভাব ধারণ করিয়া রহিলেন।

প্রথমে কোন কথাই কহিলেন না ; শেষে খঞ্জনীটার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওটা কি একটা ?"

আমি অতি সঙ্কুচিতভাবে উত্তর করিলাল "ওটা একটা খঞ্জনী।"

তিনি চোক ঘুড়াইয়া জেরা করিলেন "ওটা কোথা হইতে যোগার হইল।

আমি ভীতভাবে উত্তর করিলাম "এক বৈরাগী ঠাকুরের কাছ থেকে নিয়াছি।"

তিনি সেই ভাবেই আবার প্রশ্ন করিলেন "কেন ? বৈরাগী হইতে হইবে নাকি ?"

বাবার ভাব দেখিয়া বড়ই ভয় হইল। আমি মুখে আর কোন কথা বলিতে পরিলাম না ; কিন্তু মনে মনে উত্তর করিলাম, "যদি মনোমত বৈষ্ণবী মেলে।" পরে তিনি আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমি আস্তে আস্তে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম এবং বিবাহসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যানে কতদূর কি দাঁড়াইয়াছে, তাহাও বুঝিয়া নিলাম। আর তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস হইল না—সেই হইতেই আমি পলাইয়া পলাইয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম।

পূজার দিন যতই নিকটস্থ হইতে লাগিল, ততই নরেশের কথা মনে পড়িতে লাগিল। পূজার সময় সে বরাবরই আমাদের ওখানে থাকিয়া সকল কার্য্যে আমার সাহায্য করিত; এবার আমি একা। বরাবর আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিতাম; এবার ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক আমিই তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি। একে এই দুঃখে সর্ব্বদাই দুঃখিত, তাহাতে আবার বাবার ভাবে অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রায়ই আমার ঘরে বই খুলিয়া বসিয়া চিন্তা করিতাম;

কোন সময় বাহির হইলেও বিমনা হইয়া ঘুড়িতাম মাত্র। ফলে অধিবাসের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সাজান গাজান কিছুই হইল না।

সে দিন আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাবা আসিয়া আমার ঘরেই উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন "তোমাকে কি ভূতে পাইয়াছে যে আজ পর্য্যন্তও ঘরের কোনে চুপ করিয়া বসিয়া আছ? এবার আর কোন কাজকর্ম্ম করিতে হইবে না, না?"

আমি ভয়ে ভয়ে উত্তর করিলাম "আমার শরীর বড়ই খারাপ।"

শুনিয়া বাবা উত্তর করিলেন "হাঁ তা বুঝিয়াছি! ওঝার দরকার! তা আমিও ভূত ছাড়াইতে জানি! ওঠ গাধাটা! যা এখনি যাইয়া আটচালা মণ্ডপ সাজাইতে আরম্ভ কর, না হইলে এখনি তোর ভূত ছাড়াইয়া দিতেছি!"

বাবা এই কথা বলিতেই মা আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়া কহিলেন "আচ্ছা তুমি যাও, আমিই ওকে পাঠাইয়া দিতেছি; একে ওর শরীর খারাপ তাহাতে ত বসিয়া পড়া শুনাই করিতেছে,—এভাবে রাগ না করিয়া যাহা বলিতে হয়, শান্ত বাক্যে বলিলেই চলে। আয় বাবা, তুই যা পারিস্ বাহির বাড়ীতে আসিয়া সাজাইয়া রাখ" মা এই কথা বলিতে বলিতে আসিয়া আমার হাত ধরিলেন; আমিও আস্তে আস্তে উঠিলাম। তখন "ভারি ত পড়া-শুনা! যাহা করিয়া আসিতেছেন, সবই জানি" বাবা এই কথা বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন; আমিও মার সঙ্গে সঙ্গে বাহির বাড়ী চলিলাম।

আমি নিজেই কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়াছি বলিয়া এ দিনও

বাবার তিরস্কার সহ্য করিলাম এবং নিতান্ত বিরসভাবে যাইয়া আটচালা মণ্ডপ সাজাইতে লাগিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া রামচরণ ও রাধা আসিয়া আমার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল এবং নানা কথা তুলিয়া আমার মনটাকে যাহাতে শান্ত করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রামচরণ বলিল, "এতদিন পরে তোমাদের সে দিনকার কথার ভাব বুঝিলাম, দাদাবাবু!"

অমনি রাধা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন দিনকার কথা ? রামচরণ!"

রামচরণ ধমক দিল, "আরে তোর মতন রাধায় সে সব প্রেমের কথার বুঝিবে কি ?"

রাধা ব্যঙ্গ করিল, "যে রামচরনের গুণে নিরেট পাষাণও প্রেমময়ী অহল্যারূপে পরিণত হইল, সেই রামচরণের গুণে কি এ রাধা সেই রাধাও হইতে পারিবে না ?"

রামচরণ জবাব দিল, "এ রামচরণের যদি সেই গুণই থাকিত, তাহা হইলে রাধার আর ঘরে থাকিতে হইত না।"

শুনিয়া রাধার যেন কোন পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইল। তাই একটু উদাসভাবে বলিল, "রাধা কি আর ঘরে আছে ? সেত বহুদিন পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে!"

এবার রামচরণ যেন একটু নরম হইল। বলিল, "তবে আর আমার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া দাদাবাবুর কাছেই জিজ্ঞাসা কর; প্রেমের কথা উঁহারাই বেশ ভাল বুঝিয়াছেন।"

তখন রামচরণকে ছাড়িয়া রাধা আবার আমাকে ধরিল। কহিল "বল না, দাদাবাবু! কার প্রেমের কথা হইতেছিল ?"

আমি আর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। হাসিয়া উত্তর করিলাম, "রাধা বই আর প্রেমের কথা আছে কার!"

"সে এক দিন ছিল; এখন আর তার আছে কি?" বলিয়া রাধা যেন একটু আক্ষেপ প্রকাশ করিল।

তাহাতে রামচরণ উপহাস করিল, "আর কিছু না থাক, সে ভাবটা তো আছে!"

"তোমার আর ভাব বুঝিতে হইবে না! এখন চোক বুজিতে পার কিনা তাহাই দেখ!" বলিয়া রাধা যেন একটু গরম হইয়া উঠিল।

"তা চোক বুজিলেও ত সেই ভাবই দেখি" বলিয়া, রামচরণ চক্ষু মুদ্রিত করিতেই রাধা বলিয়া উঠিল, "দাদাবাবু! ওর কিন্তু অন্তিমকাল উপস্থিত; যদি বাচাইতে চাও, তবে এখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা কর!"

এমন সময় আবার মা আসিয়া রাধাকে ডাকিয়া নিলেন। তখন রামচরণ বলিয়া উঠিল "আহা! এমন রহস্যটা মা ভাঙ্গিয়া দিলেন!"

"তুমি আর আক্ষেপ করিও না! রাধাকে ক্ষেপাইতে যাও—তোমার অদৃষ্টে কিছু আছে জানিও!" আমি এই কথা বলিতেই রামচরণ গর্বিতভাবে উত্তর করিল, "তা থাকিলে আর কি করিব! তথাপি ও যে আমাদের সঙ্গে উপহাস করিতে আসিবে, তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না।"

রামচরণের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তায় সারাদিন বসিয়া আট চালা মণ্ডপ সাজাইলাম। বাবা আসিয়া মুখে কিছু না বলিয়া, "আমরা কি করি, না করি" তাহা মাঝে মাঝে দেখিয়া যাইতে

লাগিলেন। সারাটা দিন পরিশ্রমের পরে আমার শরীরটা বস্তুতই একটু অলস বোধ হইতে লাগিল; তাই রাত্রে আহারান্তে আর কোন কাজ না করিয়া আবার আমার ঘরেই যাইয়া বসিলাম।

কিছুকাল পরে রাধা আসিয়া সকালের সেই কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় আমি উত্তর করিলাম "কোন কথা, তাহা ত আমি জানি না,—রামচরণ জানে; বরং তাহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর।"

রাধা সাগ্রহে বলিল "না, দাদাবাবু! পরিহাস করিও না—সত্য বল, কি কথার ভাব রামচরণ বুঝিল।"

আমি দেখিলাম, যে রাধা সে কথা না শুনিয়া আর কিছুতেই ছাড়িতেছে না; বিশেষ বলায় কোন ক্ষতি নাই; না বলিলেই বরং উহার ডাল পালা বাহির হইবার সম্ভাবনা আছে; সুতরাং তাহার নিকট আমূল ঘটনা আবার বিবৃত করিয়া বলিলাম।

শুনিয়া রাধা বলিল "তাই ত! তোমার বিবাহসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যানের যে এ জাতীয় আর একটা গুরুতর কারণ আছে, তাহা ত আমরা জানিতাম না! এ যাহা ঘটনা, তাহাতে তোমার ত কোনই দোষ নাই; তথাপি কর্ত্তাবাবু তোমার উপর চটিয়া আছেন কেন!"

আমি আক্ষেপ করিলাম "ওটা দেখিতেছি আমার অদৃষ্টেরই দোষ; না হইলে আমি সকলেরই মন যোগাইতে যাইয়া সকলের নিকটেই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছি এবং সকলের নিকটেই কিছু না কিছু তিরস্কার পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

"বস্তুতই দাদাবাবু! তোমার অবস্থায় বড়ই দুঃখবোধ হইতেছে। তুমি এ সব আর ভাবিও না। যাহা করেন, ঈশ্বর ভালর জন্যই করেন; এ সব কথা জানিলে তোমাকে আর কেহ দোষ দিতে

পারিবে না। তুমি যাও এখন শোও গিয়া; কাল হইতে পূজার কাজকর্ম্ম দেখিও— ও সব কথা আর মনে করিও না" বলিয়া রাধা বাহির হইয়া গেল।

রাধার কথানুসারে আমি গিয়া শুইয়া পড়িলাম বটে; কিন্তু চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি ত জ্ঞাতসারে কোন পাপ করি নাই; বরং আমার জন্য কাহারও মনে কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেই কামনাই চির দিন করিয়া আসিয়াছি; তথাপি আমার এত নিগ্রহ কেন? ইহার কোন সদুত্তর খুঁজিয়া না পাওয়ায় সংসারের উপর বড়ই বিরাগ আসিয়া পড়িল? কারণ এ সংসারে লোকে মন বোঝে না,— সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্যেও কোন কাজ করিলে নিজের মনোবৃত্তি অনুসারে, তাহার যে যার মতন ব্যাখ্যা করিয়া লয় এবং সর্ব্বদাই তাহা সমর্থন করিবার চেষ্টা করে। অতএব ইহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য!

সংসার পরিত্যাগ করিয়া নরেশ বেশ কাজ করিয়াছে! আর যে কারণে সে ত্যাগ করিয়াছে, সে কারণটাও বেশ সঙ্গত কারন। সামান্য একটা স্ত্রীলোকের প্রতি লোকের যেরূপ আসক্তি আসিয়া পড়ে,—তদ্‌গতচিত্ত হইয়া তাহার যেরূপ সেবার্চ্চনা করে, এবং তাহার বিরহে এই জগৎটাকেই যেরূপ তন্ময় বলিয়া বোধ করে, ঈশ্বরের প্রতি যদি সেইরূপ আসক্তি আসে, তদ্‌গতচিত্ত হইয়া যদি তাঁহার সেইরূপ সেবার্চ্চনা করে, আর তাঁহারই বিরহে এই জগৎটাকেই যদি তন্ময় বলিয়া বোধ করে, তাহা হইলে ভগবানকে পাইতে অত বিলম্ব হয় না। সুতরাং যাঁহারা বোঝে তাহাদের নিকট 'অনুরাগে বৈরাগ্যটা' উপহাসের বিষয় নহে—অত্যন্ত

গৌরবের বিষয়; এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া হইলে, ভগবৎ-প্রেমেই মত্ত হওয়া সঙ্গত। এইরূপ সমাধানে উপনীত হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম "যদি হইতেই হয়, তাহা হইলে ভগবৎপ্রেমেই মত্ত হইব এবং নরেশের অনুগামী হইয়া অনন্ত প্রেমের আধার সেই পরমকারুণিক পরমেশ্বরকেই প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিব।"

যখন এই কল্পই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তখন মনে এক অভূতপূর্ব্ব শান্তির উদয় হইল, সংসারের সকলই সুখ ও শান্তিময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম "যদি চরম লক্ষ্য ভগবানে স্থির থাকে, তাহা হইলে সংসারে পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি যে একান্ত আসক্তি তাহা পরাভক্তির বিভিন্ন সোপান মাত্র।" তখন নরেশের বিচ্ছেদের জন্য আর কোন দুঃখ রহিল না। মনে হইতে লাগিল সে যেন আমার অতিনিকটেই আছে এবং তাহার অনুগামী হইবার জন্য আমাকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার তন্দ্রা আসিল। তখন স্বপ্নে শুনি নরেশ আবার গাহিতেছে:—

ওগো! তোদের ভয় কিরে তায়!
(আমি) অকূলকাণ্ডারী হরি তুলে নিব, আয়।

এদেশেতে সুখী জনে শোক তাপ নাহি জানে;
ওদেশেতে দুঃখ দৈন্যে টেকা বড় দায়!

তোদের আমি জনে জনে কত যে ডাকি;
শুনেও শুনিস্ নে তোরা সুখেতে থাকি।
দুঃখে ফিরে চেয়ে ভুলিস্; তাই আবার ডাকি।
তবু কিরে থাকবি তোরা, ভুলিয়ে মায়ায়?

তখন স্বপ্নে স্বপ্নেই বলিয়া উঠিলাম "নরেশ, ভাই দাঁড়াও; আমিও আসিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রভাতের আলো বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন সেই প্রভাত যেন আমার নূতন জীবনের নূতন প্রভাত বলিয়া মনে হইতে লাগিল— সেই নবোদিত সূর্য্যের স্নিগ্ধ আলোক আমার মনের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করিয়া যেন এক নূতন জ্ঞানালোক,-সমস্ত সন্তাপ বিদূরিত করিয়া এক অননুভূতপূর্ব্ব শান্তি, প্রদান করিতে লাগিল। তাহাতে উৎসাহিত হইয়া সেই সময়েই আমি জগন্মাতার পূজার কার্য্যে লাগিয়া গেলাম।



একাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

অধিবাস, সপ্তমী ও অষ্টমী এই তিন দিনই মায়ের পূজা যথাবিধি সম্পন্ন হইল। মায়ের কৃপায় এ কয়দিন আর কোনরূপ অশান্তির কারণ উপস্থিত হইল না। নবমীর দিন অপরাহ্নে নরেশের সেই বৈরাগীর সাজে সজ্জিত হইয়া সেবাশ্রমে যাইয়া সংকীর্ত্তনের দলে যোগ-দান করিলাম। আমার সেই সাজ দেখিয়া সকলে আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং আমাকেই গুরু-পদে বরণ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া মৎপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিল। সর্ব্বত্রই খঞ্জনীটা বাজাইয়া আমি মূলে, পিছনে সকলে গাহিতে লাগিলাম:—

(মোরা) কারে পূজা করি?
একি সেই মহাশক্তি দুর্গামূর্ত্তি,
দানবদলনী হরী?

যে শক্তি পদতলে দলিয়ে দৈত্যকুলে,
শাসিত বাহুবলে যত অত্যাচারী;
রক্ষিত দশদিকে দশভুজ বিস্তারি;—
"তারেই কি পূজি মোরা" বুঝিয়ে বুঝিতে নারি।

যে দেবী সর্ব্বভূতে বিরাজে শক্তিরূপে,
তার উদ্বোধন একপে ঘটের উপর করি;—

শুধু 'নমস্তস্যৈ' ব'লে তারি পূজা সারি ;
বলি দিয়ে পাঁঠামহিষ আত্মবলি যাই পাসরি ।

যে দেবী সিংহের পরে দাঁড়ায়ে অস্ত্র ধরে,
হুঙ্কারে ভস্ম করে কত শত অরি ;
মোরা কি তারে ভজি সে রূপ নেহারি ?
পৌত্তলিক এরেই বলে ! দেনারে এ পূজা ছাড়ি ।

আমাদের নবীন জীবনে এই নবীন বেশ দেখিয়া এবং আমাদের অশ্রুতপূর্ব্ব এই গানের অভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিয়া সকলেই মাতিয়া উঠিল, ও আবালবৃদ্ধ সকলেই দলে দলে নিশান হস্তে আসিয়া আমাদের স্কন্ধে যোগদান করিতে লাগিল এবং "বন্দেমাতরম্" রবে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া তুলিল। তখন যে আনন্দ, যে গৌরব, যে ভ্রাতৃত্ব, যে মাতৃভক্তি অনুভব করিতে লাগিলাম, তাহা যদি স্থায়ী হইত তাহা হইলে মা আমাদের ভুলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেন না — নিশ্চয়ই আবার শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণা মহাশক্তিরূপে আমাদের মধ্যেই অবতীর্ণা হইয়া, দেবতাদের ন্যায় আমাদেরও মুক্তি বিধান করিতেন ; এবং আমরাও ভ্রাতৃত্বের অভেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ভারতের লুপ্তগৌরব উদ্ধার করিতে পারিতাম।

কিন্তু আমরা চিরন্তন দাস্য ও ভিক্ষাবৃত্তির প্রভাবে এতই দুর্ব্বল এতই হীন, এতই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের সকল উদ্দীপনা, সকল উচ্ছ্বাস অচিরে অন্তরের অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া যায়—কোন ভাবই স্থায়ীভাবে পোষণ করিতে পারি না ; তদনুসারে কার্য্য করিবার শক্তি ত একেবারেই নাই ; আর থাকেই বা কি করিয়া ? আমাদের শিক্ষায় দাস্য, দীক্ষায় দাস্য, ধর্ম্মে দাস্য, কর্ম্মে দাস্য —দাস্যই আমাদের

জীবনসম্বল! তাহার চিরসঙ্গিনী ভিক্ষার ঝুলি ত কাঁধে চড়িয়াই আছে—অনশনে, কি অর্দ্ধাশনে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত না হয় এজন্য তাহা পূর্ণ করাও ত একান্ত আবশ্যক। তাই সে পূর্ব্বভাব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিতে করিতে শেষে পতিতপাবন হরির চরণে আশ্রয় লইয়া তাহারই গুণসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম।

যাহারা লিডার হয়, তাহারা সকল অবস্থায়ই লিডার। হরিসংকীর্ত্তনেও আমি মূলে, পিছনে সকলে গাহিতে লাগিলাম। গাহিতে গাহিতে যখন আমাদের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আমার এমন ভাব লাগিয়া গেল যে, আমি দু'বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম এবং গানও এমনি জমিয়া গেল যে, উপস্থিত জনমণ্ডলী সম্পূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সংকীর্ত্তন ক্ষান্ত হইলে বাবা সহযোগী সেবকগণকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের এই নূতন মহাপ্রভু কি এ-ই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন নাকি?" তাঁহার কথার ভাবে সকলেই একটু হাসিল,—মাঝখানে কে যেন অলক্ষ্যে উত্তর করিয়া বসিল "তা আর অসম্ভব কি?"

তখন চণ্ডীমণ্ডপস্থিতা প্রভার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। শুনিলাম সে মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করিল "মা, উঁহারা এরূপ বেশ ধারণ করিয়াছে কেন?"

মা উত্তর করিলেন "বৈরাগী না সাজিলে ভিক্ষা দিবে কেন?"

প্রভা সে উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না—উদ্বিগ্নভাবে আমার প্রতি মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আমি বাবার ও তাহার মনোভাব তুলনা করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে

বাবা আমাদের বার্ষিক চাঁদা দিয়া দিলেন ; আমরাও আবার সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সে দিন ফিরিয়া আসিতে রাত্রি প্রায় একটা বাজিয়া গেল। আসিয়া দেখি সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—কেবলমাত্র বিদ্যাধর ঠাকুর মহাশয় বসিয়া তামাক খাইতেছেন, আর খক্, খক্ করিয়া কাশিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কে? বাবা সুরেশ আসিয়াছ? যাও, বাড়ীর ভিতরে গিয়া মাকে ডাক। তিনি উঠিয়া তোমাকে ভাত দিবেন" বলিয়া গিয়া শুইয়াছেন।"

"আপনি যে এখনও বসিয়া আছেন? আপনার চোকে আর বুঝি ঘুম নাই?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি বাড়ীর ভিতরে চলিলেই ঠাকুর মহাশয় বাধা দিলেন "আরে! যাবে ত যাবেই! তবে প্রশ্নটা যাহা করিলে, তাহার উত্তরটা অন্ততঃ শুনিয়া যাও।"

আমি ফিরিয়া কহিলাম "আচ্ছা বলুন।"

তিনি বলিতে লাগিলেন "দেখ, চন্দ্রের ন্যায় মানবাত্মারও হ্রাস বৃদ্ধি, অমাবস্যা পূর্ণিমা আছে; আর শুক্ল-পক্ষ কৃষ্ণ-পক্ষও আছে।"

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কেমন?"

তিনি উত্তর করিলেন "বুঝিলে না? দেখ মানবাত্মার পক্ষে চৈতন্য হইয়াছে পূর্ণিমা, আর নিদ্রা হইয়াছে অমাবস্যা; জীবন হইয়াছে শুক্লপক্ষ, আর মরণ হইয়াছে কৃষ্ণপক্ষ; বাল্য হইয়াছে শুক্লপ্রতিপদ, কৌমার দ্বিতীয়া, যৌবন তৃতীয়া, এইভাবে বৃদ্ধি হইতে হইতে শুক্লপক্ষরূপ-জীবনের অন্তে নিশ্চয়ই পূর্ণ চৈতন্যরূপ পূর্ণিমার উদয় হয়; পরে আবার তমোগুণের আশ্রয়ে কলায় কলায় তমসাচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণ প্রতিপদ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া করিয়া হ্রাস হইতে হইতে কৃষ্ণপক্ষরূপ মরণের অন্তে

নিদ্রারূপ অন্যাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, কাজেই তখন আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই নিদ্রার হ্রাস হইতে থাকে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথাটা মনে বড়ই লাগিল, বলিয়া উঠিলাম। বস্তুতই ভট্টাচার্য্য মহাশয়! বড় সুন্দর কথাটা বলিয়াছেন! আপনি অন্বর্থনামা পুরুষই বটে! এ সব ত শাস্ত্রীয় কথা; না?"

তখন আত্মপ্রসাদের মোহিনীমূর্ত্তি স্বদেহেই অঙ্কিত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের সনাতন হিন্দুশাস্ত্রাদির অবহেলা করিয়া থাকে; কিন্তু নির্ব্বোধেরা এ সামান্য কথাটা বোঝে না যে, আপনার বস্তুকে চিরদিনই আপনার করিয়া রাখিতে হয়; তাহা না পারিলেও, কোনদিন অবহেলা করিতে নাই। কারণ উহার ভিতরেই ত আপনার বলিবার যাহা কিছু আছে সকলই। উহা না থাকিলে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িতে হয়। আর আদর না করিলেই বা উহা থাকে কি করিয়া? অনাদরে কেহ কোথাও থাকিতে পারে? কেহই পারে না। সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রাদির আদর না করিলে, উহা থাকিবে না; আর উহা না থাকিলে তোমরা যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া আপনার বলিতে যদি কিছু নাই পাও, তাহা হইলে তোমাদের বাঁচিবার উপায় থাকিবে না — হতাশেই মরিয়া যাইতে হইবে। এই ভাবে সংস্কৃতশাস্ত্রাদির অবহেলা করিয়া তোমাদের নিজেদের মৃত্যু নিজেরাই ডাকিয়া আনিতেছ। আরে! নির্ব্বোধেরা! তোদের পক্ষে ইংরাজি শিক্ষার, ইংরাজী রীতিনীতির কি এই চরম ফল?"

আমার এ সময় একটু শুনিতে ইচ্ছা হইল। আমি আমার বলিলাম "হাঁ! আপনি ত ঠিক বলিতেছেন!"

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আপনার জিনিষকে ভাল বাসিতে হইবে—আদর করিতে হইবে। এমন ভালবাসিতে হইবে,— এমন আদর করিতে হইবে যে, তাহা রক্ষার্থে যদি আবশ্যক হয়, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। তাহা হইলে তোমাদের বলবীর্য্য, ধনসম্পদ, সম্মান গৌরব, সুখ-শান্তি, আশা ভরসা — সকলি আবার ফিরিয়া পাইবে; আর না হইলে ইহা নিশ্চয় জানিও যে, তোমাদের মৃত্যু অতিনিকটবর্ত্তী।"

আমি এবার সম্পূর্ণ বিস্মিত হইলাম। আবারও বলিলাম, "বেশ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! বেশ বলিয়াছেন!"

তিনি এবার আত্মগৌরবে স্ফীত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বেশ, নিজের ঘরে কি আছে না আছে তাহা না দেখিয়াই, পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? দিলেও, পরে তোমাকে কোন মূল্যবান্ জিনিষ দিতে চাহিবে না; আর ঘর খালি ফেলিয়া গেলে, তোমার যাহা কিছু মূল্যবান, তাহা পরেই নিয়া যাইবে। কাজেই তাহাতে তোমার আর মূল্যবান বলিতে কিছুই থাকিবে না— নিজেরও না, পরেরও না! ফলে তোমার পক্ষে চিরদিনই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না করিয়া তোমার যাহা কিছু আছে, তাহারই আদর যত্ন করিয়া মূল্য বাড়াইতে চেষ্টা কর; তাহা হইলে দেখিবে ঘরে বসিয়াই সব পাইবে—আর পরের দুয়ারে যাইতে হইবে না!—পরে তাহাদের মূল্যবান্ জিনিষ [illegible] দিয়া তোমারটা যাহাতে নিতে পারে, তাহার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে। এখন পরেরটাকে আপনার করিবার জন্য তোমরা এমন যে প্রয়াস করিতেছ; তাহা আর করিতে হইবে না।"

যদিও তাঁহার কথাগুলি অতিশয় মূল্যবান্ বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তাহাতে আমি বেশ একটু আনন্দই অনুভব করিতেছিলাম তথাপি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আত্মগৌরবটা একটু পরীক্ষা না করিয়া পারিলাম না। বলিলাম, "আপনি এ যাহা বলিলেন, তাহা আমি আংশিক স্বীকার করি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারিতেছি না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন! ইহাতে তোমার কি আপত্তির বিষয় আছে?"

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ, আছে! ধরুন, আপনাদের শাস্ত্রেই ত বলে 'ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীৎ অঙ্গুলীবোড়গক্ষতা" আমার হইলেই যে সব জিনিষের আদর করিতে হইবে এমন নয়; যে জিনিষটা খাঁটি তাহার আদর যত্ন করিতে হইবে, আর যেটা দুষ্ট তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর তাহা না করিলে, দুষ্ট জিনিষে খাঁটি গুলিও নষ্ট করিয়া ফেলিবে।"

এবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু গরম হইয়া উঠিলেন। কাজেই স্বরটাও একটু চড়িল এবং কথাটার উপর একটু জর দিয়া বলিলেন, "আমাদের সবই খাঁটি।"

আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "কিন্তু আপনারা নিজেরা বাদে?

এবার তাঁহার স্বর আরও একটু চড়িল। তিনি অধীর হইয়া বলিলেন "এমন কথা কেহই বলিতে পারিবে না। আমরাই যদি খাঁটি না হই, তাহা হইলে জগতে কেহই খাঁটি নাই, স্পর্দ্ধার সহিত এ কথা বলিতে পারি।"

আমি প্রত্যুত্তর করিলাম, "দেখুন, যে যতটা খাঁটি হয়, তাহা

সকলের কাছেই খাঁটি—আপনাদের কাছেও খাঁটি, আমাদের কাছেও খাঁটি। আর যেটা অখাঁটি, সেটাও সকলের নিকটই অখাঁটি হওয়া সঙ্গত। যদি তাহা না হইয়া অখাঁটিটা কাহারও নিকট খাঁটি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে নিজেই অখাঁটি; কারণ অখাঁটির কাছে ছাড়া, অখাঁটি খাঁটি হইতে পারে না। আমাদের সবই খাঁটি, এই কথাটাই প্রমাণ করে যে আপনারাই অখাঁটি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার চটিয়া লাল হইলেন এবং নির্ধূম হুকাটা পরিত্যাগ করিয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, আমি ও কথা শুনিতে চাই না! তুমি বল, আমাদের কি অখাঁটি আছে?"

বাবা সামনেই একখানা বিছানায় শুইয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না! একটু যে ঘুমাবো, তাহাও ইহারা দেবে না! ওটার ত যেন মাথাই খারাপ হইয়া গিয়াছে! ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনার মাথাও কি ওর সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হইয়া উঠিল যে, রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় বসিয়া খাঁটি, খাঁটি করিতে আছেন।"

বাবার কথা শুনিয়া আমি তখনই সেখান হইতে উঠিয়া পালাইলাম এবং নিজের ঘরে যাইয়া আলো ধরাইতেই দেখি, প্রভা আসিয়া উপস্থিত হইল। অত গভীর রাত্রে প্রভাকে আমার ঘরে একাকিনী প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমি একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে? প্রভা! তুমি এত রাত্রে যে।"

সে একটু গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "হাঁ, আমি; এতরাত্রে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমন কি কথা আছে, যাহার জন্ত এখনও তোমার ঘুম পায় নাই?

উত্তরে অত্যন্ত আবেগের সহিত সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমাকে এ সাজে কে সাজাইয়া দিল ?"

কে আর সাজাইবে ? আমি নিজেই সাজিয়াছি ! কেন তাহাতে কি হইয়াছে ?

না, তোমাকে এ সাজে ভাল দেখায় না ! এটা খুলিয়া ফেল।

এই জন্যই কি তোমার ঘুম হয় নাই ? এটা কি এতই উদ্বেগের বিষয় ?

তা যে জন্যই হউক ! আমার অনুরোধ—তুমি এটা পরিত্যাগ কর।

আচ্ছা ধর, আমি নিজে না সাজিয়া যদি তুমিই আমাকে এই সাজে সাজাইয়া থাক, তাহা হইলেও কি এ সাজ পরিত্যাগ করিতে হইবে ?

প্রভা এবার আরও গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল ;—যেন আমার কথার সত্যতা পরীক্ষার্থ তাঁহার সমস্ত দৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত করিয়া নয়নদর্পণে আমার অন্তরের অন্তর-টাও একবার ভাল করিয়া দেখিয়া নিল। পরে তাহার সেই ইন্দীবর-নিন্দিত প্রশান্তায়ত লোচনদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। আমি নির্বাক নিস্পন্দভাবে তাহার সেই প্রেমসুন্দর দিব্য মূর্ত্তির ধ্যান করিতে লাগিলাম।

কিছুকাল পরে সে অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া প্রীতিমধুরস্বরে বলিল, "যদি ভগবান আমার উপর এতই প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি নিজেই আবার এ সাজ খুলিয়া রাখিব," এই বলিয়া প্রভা আসিয়া আমার আলখেল্লার বোতাম খুলিতে আরম্ভ

করিল। আমি তাহার সেই তন্ময়তার ভাব দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। —তাহার কোমলস্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল।

একমনে পোষাকটী খুলিয়া লইয়া প্রভা একটু সরিয়া দাঁড়াইল; পরে অতি করুণস্বরে বলিল, "আমার আর একটী প্রার্থনা আছে, তাহাও তোমাকে পূরণ করিতে হইবে।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার আর কি প্রার্থনা আছে?

তোমাকে জামাজুতা পরাইয়া এখনি একবার দেখিতে চাই

কেন? তোমার এ আগ্রহ কেন?

এখনো আমার ধাঁধা ঘোচে নাই; —তোমার এ নগ্নদেহেও তোমাকে সেই নবীনসন্ন্যাসীরূপেই দেখিতেছি; তাই তোমাকে সংসারী সাজাইয়া আমার এ ভ্রম দূর করিতে চাই।

তুমি কি আমাকে সংসারী সাজাইতে পারিবে? না, ভগবানের অভিপ্রায় সেরূপ নয়; তোমার ভ্রম সত্যতায়ই পরিণত হইতে চলিয়াছে।

সেই আশঙ্কায়ই আজকে তোমাকে একবার সংসারী সাজাইয়া দেখিতে চাই।

এই রাত্রেই কি তোমার সব সাধ মিটিবে?

না মিটিলেও, আমি মিটাইব! কারণ আমার প্রাণেই আজ বলিতেছে, "আমি আর এমন অবসর পাই কিনা, সন্দেহ!"

"তোমার যদি এমনি ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর তোমার কার্য্যে বাধা দিব না।" আমি এই কথা বলিতেই প্রভা সেই গৈরিক

বসনটী রাখিয়া আলনা হইতে জামাকাপড় নিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, "তুমি নিজেই এবার পড়।" আমি নিরাপত্তিতে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল প্রভা! তোমার আর কি সাধ আছে? বল।"

প্রভা আর কোন কথা বলিতে পারিল না;—দীন হীন ভিখারিণীর ন্যায় সজলনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই করুণ দৃষ্টিই যেন তাহার সকল সাধ—সকল দৈন্যের কথা জানাইয়া বলিতে লাগিল, "ভিখারিণীর কোন কথা বলিবার অধিকার নাই; তুমি দয়া করিয়া যাহা দাও, তাহা দ্বারাই তাহার সকল দৈন্য—সকল সাধ মিটাইতে হইবে।"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া আমার পার্শ্বে বসাইলাম এবং অর্দ্ধালিঙ্গনে বেষ্টিত করিয়া কাতরভাবে আবারও জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল প্রভা! বল, তোমার আর কি সাধ আছে?"

তখনও সে কোন উত্তর করিতে পারিল না। শুধু আমার বক্ষে ঢলিয়া পড়িয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া কিছুকাল তন্ময় হইয়া রহিলাম; পরে সস্নেহে তাহার মুখখানি তুলিয়া অশ্রুজল মুছাইয়া দিলাম। সে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিতেই সাদরে প্রশ্ন করিলাম "বল ত, প্রভা! এই হাসি কান্নার সংসারে হাসি সুন্দর, না কান্না সুন্দর এবং কিসেই বা সুখ বেশী?"

কিছুকাল মনে মনে বিচার করিয়া সে উত্তর করিল "কান্নাই সুন্দর এবং তাহাতেই সুখ বেশী।

"যদি তোমার আমার চিরদিনই এইরূপে কাঁদিয়া কাটাইতে হয়, তাহা হইলেও কি আমরা সুখী হইতে পারিব?" আমি আবার এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে আবেগভরে উত্তর করিল, "যদি এমন আর একটা দিনও পাই!"

"তাহা হইলে এখনি আমাকে সেই পূর্ব্বসাজে সাজাইয়া দাও" আমি এই অনুরোধ করিতেই প্রভা আর কোন আপত্তি না করিয়া আমার জামা কাপড় নিজেই খুলিয়া রাখিল। পরে নিজেই আবার আমাকে সেই সন্ন্যাসিবেশে সাজাইয়া দিয়া অশ্রুপূর্ণ কাতর নয়নে একটু সরিয়া দাঁড়াইল;—যেন সেই আমাকে প্রস্থানের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া তখন দণ্ডায়মান হইতেই সে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল এবং তাহার কোমল করপল্লব দ্বারা আমার দক্ষিণ পদ গ্রহণ করিয়া একবার মস্তকে স্পর্শ করাইল, পরে তাহার বক্ষে ধারণ করিয়া বলিল "দেব! আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, যেন আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়!"

"অচিরে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে" আমি এই আশীর্ব্বাদ করিতেই সে আমার পা ছাড়িয়া দিল; আমিও ভগবানের নাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ঊর্দ্ধে উদার অনন্ত গগনমণ্ডল,—নিম্নে উদার অনন্ত অবনীতল; মাঝখানে দাঁড়াইয়া সান্ত জীব আমার উদাস প্রাণে অনন্তভাবের ছায়া পাত হইল—মনে হইতে লাগিল আমিও যেন সেই অনন্তেই কোন দিন মিশিয়া ছিলাম—আবার সেই অনন্তেই মিশিয়া যাইতেছি।

তখন সংসারের উদ্বেগচিন্তা, পাপতাপ সকই প্রশমিত হইয়া গেল এবং আমি এক দিব্য মহান্ ভাবে প্রভাবিত হইয়া নিয়তির আহ্বানে অবাধগতিতে চলিতে লাগিলাম।

অতিপ্রত্যূষেই ষ্টেসনে পৌছিয়া ৫ টার ট্রেনে কলিকাতায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম; পরে পঞ্জাবমেলের ৯টার ট্রেন ধরিয়া পরের দিনই কাশীধামে উপনীত হইলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

কাশীতে যাইয়াই আমার নরেশের কথা মনে পড়িল; সেই ত সকল রকমে আমার দীক্ষাগুরু—আমার পথপ্রদর্শক;—তাহার মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আমি ত তাহারই পথ অনুসরণ করিতেছি! কিন্তু সে কোথায়? আমি ১৫দিন পর্য্যন্ত নিয়ত অনুসন্ধান করিলাম; তথাপি তাহার উদ্দেশ পাইলাম না। শেষে হতাশ হইয়া মনে করিলাম, "যখন সবই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি তখন নরেশকে আর অত খুজিতে যাই কেন? তাহার দেখা পাই ত বেশ, নতুবা একাকীই আমার পন্থা নির্দ্দেশ করিব।"

তখন কাশীধাম আর ভাল লাগিল না। প্রতিদিন অন্নপূর্ণার প্রসাদে জীবন ধারণ করাও নিতান্ত কষ্টকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তাই কোন সাধুসন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে বিচরণ করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমার চক্ষে প্রকৃত সাধু দেখিতে পাইলাম না। পরে যথাকথিত এক সাধুর দলে মিশিয়া প্রয়াগ ও নৈমিষারণ্য হইয়া হরিদ্বারে যাইয়া পৌছিলাম। সেখানে এক পণ্ডিত সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি নৈমিষারণ্যে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া শিষ্যদিগকে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র পড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া পড়ায় তিনি আমাকে অন্যতম শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার সহিত

নৈমিষারণ্যে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম।

আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট পূর্ণ ছয় বৎসর কাল অধ্যয়ন করিবার পর তিনি মহাসমাধি প্রাপ্ত হইলেন। তখন আর ফিরিতে ইচ্ছা হইল না—এক জন সহপাঠী ছাত্রকে নিয়া তীর্থদর্শনে বহির্গত হইলাম।

প্রথমে কনখল, দ্রোণাশ্রম (ডেহরাডুন) জ্বালামুখী, লক্ষ্মণঝোলা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া, পরে দেববাঞ্ছিত সেই হিমালয়ে আরোহণ করিলাম। প্রথমে গঙ্গার তীরপথ অনুসরণ করিতে করিতে, গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল, 'দেবপ্রয়াগে' যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে গঙ্গার তীরপথ পরিত্যাগ করিয়া অলকানন্দার তীরপথে হাটিতে হাটিতে বিল্বকেশ্বরে যাইয়া পৌছিলাম। এই স্থানে অর্জ্জুন মহাতপস্যায় পশুপতি মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ তদবধিই এইস্থানে মহাদেব বিল্বকেশ্বর সংস্থাপিত আছেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল 'রুদ্রপ্রয়াগে' যাইয়া উপনীত হইলাম। সে স্থান হইতে মন্দাকিনীর তীরপথে গমন করিতে করিতে 'দেবীযুদ্ধক্ষেত্রে' গিয়া পৌছিলাম। এই স্থানেই নাকি দেবী দুর্গা চণ্ডীবর্ণিত মোহিনীমূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়া দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। পরে সে স্থান হইতে 'শোনপ্রয়াগ' প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান সন্দর্শন করিয়া ক্রমশঃ চড়াই (আরোহণ), উৎরাই (অবরোহণ) করিতে করিতে বহুতর শৃঙ্গ ও তুষারস্তূপ অতিক্রম করিয়া হিমালয় শীর্ষস্থ 'কেদারনাথে' যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

এই সব স্থানের অলৌকিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া মনে এক অশ্রুত, অনধীত, অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল! তাহাতে প্রভাবিত হইয়া আমাদের সকল অসমদর্শিতা, সকল সংকীর্ণতা, সকল অহঙ্কার ক্রমশই দূর হইয়া যাইতে লাগিল এবং প্রকৃতিজননীর উন্মুক্ত উদার স্নেহময় অন্তর আমাদের অন্তরেও এক গভীর ভক্তিভাব উদ্ভাসিত করিল। মনে হইতে লাগিল আর যেন পৃথিবীর সে উচ্চনীচভাব নাই—সকলই সমান হইয়া গিয়াছে; আর যেন কোথাও সে সঙ্কীর্ণভাব নাই—যে দিকে চাই সেই দিকই যেন উদার অনন্ত হইয়া পড়িয়াছে; আর যেন পৃথিবী তোমার আমার নাই—একমাত্র অনন্তদেবেরই লীলাক্ষেত্র-রূপে বিরাজ করিতেছে; আর পর্ব্বতরূপস্তন হইতে নদীরূপ অমৃতময়-স্তন্যধারা নির্গত করিয়া সন্তানের প্রতি অপার স্নেহের পরিচয় দিতেছে। লোক যতই উচ্চ হইতে উচ্চতরে আরোহণ করে, তাহার মনোভাব ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। এই কারণেই বোধ হয়, মহাজ্ঞানী যোগিগণ তাহাদের যোগস্থান হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরদেশে নির্দ্দেশ করিতেন।

আমরা আরও উচ্চ হইতে উচ্চতরে আরোহণ করিতে করিতে মন্দাকিনীর উৎপত্তিস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সম্মুখেই মহাপ্রস্থানের পথ। আমি সেই পথ অবলম্বন করিতে যাওয়ায় আমার সহযাত্রী আপত্তি করিয়া বলিল "যে পথে আরোহণ করিতে যাইয়া মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেনও পতিত হইয়াছিলেন, সেই পথে আরোহণ করিতে গেলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বাঙ্গালী যুবককে অচিরেই মহাপ্রস্থান করিতে হইবে। সুতরাং আমার মতে এ পথ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

আমি নিরুপায় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরে অন্যপথে "স্নিগ্ধ-শ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষা" ইত্যাদি এবং "নিষ্কূজস্তিমিতাঃ কচিৎ কচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনা" ইত্যাদি শ্লোকে ভবভূতিবর্ণিত, কোথাও সেই পার্ব্বত্যপ্রস্রবণপরিশোভিত স্নিগ্ধশ্যামল উপত্যকা, আর কোথাও বা সেই ঘনঘোরগহনাকীর্ণ মৃগময়ূরাদিপরিশোভিত উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া সার্থকনামা তুঙ্গনাথ মহাদেবকে দেখিবার জন্য এক অভ্রভেদী অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিবার সময়, মেঘে আমাদের সামান্য বস্ত্রাদি সব সিক্ত হইয়া গেল এবং আমরা ভট্টিকাব্যের "গিরেনিতম্বে মরুতা বিভিন্নং" ইত্যাদি এবং কুমারসম্ভবের "আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং" ইত্যাদি বর্ণনার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলাম। তথাপি সেই মেঘমালা ভেদ করিয়া আরোহণ করিতে করিতে এক নূতন রাজ্যে যাইয়া উপনীত হইলাম।

সে রাজ্যের সেই অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কল্পনা কি বর্ণনার বিষয় নহে,—প্রত্যক্ষ ও অনুভূতির বিষয়! যে কবিকুলচূড়ামণি পরমপুরুষ সেই অনির্ব্বচনীয় কল্পনাতীত পরম সৌন্দর্য্য বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন স্বয়ং তিনি ভিন্ন এমন মহাকবি নাই, যিনি তাহা বর্ণনা করা কেন, সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। মানবকবি গগনমণ্ডল, এমন কি মহাসাগরের বেলায়ও "গগনং গগনাকারং, সাগরঃ সাগরোপমঃ" বলিয়াই সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে স্থানেই অনন্ত শোভা ও অনন্ত কবিত্বের আধার সেই অনন্তদেবের একটু মাত্রও ছায়াপাত হইয়াছে, সেই স্থানেই তাঁহারা যাইতে সাহস করেন নাই; করিলেই 'তদেব তদেবোপমং' হইয়া গিয়াছে। কালিদাস কুমারসম্ভবে "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা" ইত্যাদি শ্লোকযুগে যে হিমালয়বর্ণনা করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে হিমালয় উচ্ছিষ্ট হইয়াছে মাত্র। তাহার এস্থলে—তিনি যত বড় কবিই

হউন না —"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ" এই মাত্র বলিয়াই অন্য কথা তোলা উচিত ছিল।

এইরূপ ক্ষেত্রে আমার ন্যায় হীনমতি যুবকের পক্ষে হিমালয়ের অননু-ধাবনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য কি তদ্দর্শনে মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিতে যাওয়া ত দূরের কথা, দূরতর হইতে যুক্তকরে নমস্কার করিয়া সরাই উচিত ছিল। কিন্তু যাহার যে স্বভাব, মরিলেও সে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না এবং স্বভাবের দোষে, আমি কেন, মানুষমাত্রেই যাহা দেখিয়া আসিয়াছে তাহার অন্ততঃ দুই একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না; যেহেতু তজ্জন্য তাহার একটা অসহ্য কণ্ঠকণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়। তাই বলিতেছি—

দেখিলাম, পদতলে এবং অতিদূর হইতে দূরান্তরে চতুর্দিকে শুভ্র-তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ শৃঙ্গমালা মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে; আর তাহাদের সহিত ঘনসন্নিবিষ্ট তক্রূপশুভ্র মেঘমালা ধীরে ধীরে একদিকেই অগ্রসর হইতেছে। কিছুকাল সেই দিকে চাহিয়া থাকায় আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া শূন্যপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অনন্তদেবের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি এবং আমার চতুর্দ্দিক হইতে অনন্তরূপে আসিয়া ভগবান্ অনন্তদেব আমাকে তুলিয়া নিতেছেন;— আমার দক্ষিণে অনন্ত, বামে অনন্ত, সম্মুখে অনন্ত, পশ্চাতে অনন্ত, ঊর্দ্ধে অনন্ত, নিম্নে অনন্ত, অন্তরে অনন্ত, বাহিরে অনন্ত, —আমিও যেন সেই অসীম অনন্তেই বিলীন হইতে চলিয়াছি।"

হায়! কেন আমি সেই অনন্তেই বিলীন হইয়া গেলাম না? কেন আমার সে ধ্যানযোগ ভঙ্গ হইল! আমি নিতান্ত মূর্খ; তাই সাধনার পথেও সঙ্গী লইয়া চলিয়াছিলাম। ফলে সেই সঙ্গীই আমার সে

ধ্যান ভঙ্গ করিল।—আমার তন্ময়তার ভাব দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ? চল, তুঙ্গনাথকে দেখিয়া একটু বিশ্রাম করা যাউক।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। ফিরিয়া দেখিলাম "আমার অনন্ত সেই সান্ত জীবে পরিণত হইয়াছে।"তখন আমার যে কি আক্ষেপ হইল, তাহা আর বলিতে পারি না। ভাবিলাম, "হায় ভ্রান্ত! আমি যে রূপ দেখিতেছিলাম, যদি তার একটু মাত্রও দেখিতে পাইতে তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আর তুঙ্গনাথকে দেখিতে চাহিতে না। শুধু নিজের কল্পনায় কি কবির রূপ দেখা যায়? দেখিতে হইলে, তাঁহার কল্পনার মধ্য দিয়াই কবির রূপ দেখিতে হয়! আমাদের যে সব রূপকল্পনা আছে, সে সবই কি ভগবানের রূপ? যদি তাহাই হইত, তবে অর্জ্জুন প্রভৃতিকে আর বিশ্বরূপ দেখাইতে হইত না!"

তথাপি সংস্কারবশে কাহাকেও অবমাননা করিতে পারি না? তাই দু'জনে মিলিয়া শেষে তুঙ্গনাথকে দেখিতেই অগ্রসর হইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া পরে বিশ্রামার্থ কোন গুহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। শীতে আমাদের শরীর আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল, তাই কায়মনোবাক্যে একটা অগ্নিকুণ্ডের কথাও স্মরণ করিতেছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অনায়াসেই একটা গুহা মিলিল; তাহার মধ্যে কে যেন একটা অগ্নি-কুণ্ডও রাখিয়া গিয়াছে! "একি আমার ইচ্ছা না, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা! না তুঙ্গনাথেরই অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য!" কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! ভগবান্ সর্বদা পিছনে থাকিয়াও আমাদিগকে এইরূপ কত শত ভ্রান্তিজালে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছেন! এ-ই তাঁহার লীলা!

আমরা সেই অগ্নিকুণ্ডে হাত পা গরম করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম

করিলাম। পরে দু'চার খানা শুক রুটী আহার করিয়া ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি করিলাম। হিমালয়ে আরোহণ করিবার পূর্বে আমরা দু'জনেই আমাদের প্রকাণ্ড ঝুলি ভরিয়া শুক রুটী তৈয়ার করিয়া নিয়াছিলাম। যখনই আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হইত, তখনই উহার দু'চার খানা খাইয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতাম।

সেই গুহা হইতে বহির্গত হইয়া আবার আরোহণ করিতে করিতে আমরা ভীমগড়ায় আসিয়া পৌছিলাম। প্রবাদ--স্বর্গারোহণকালে ভীমসেন নাকি একটা ধবলশৃঙ্গ হইতে গড়াইতে গড়াইতে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ নাকি এইস্থানে আসিয়া থামিয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে 'ভীমগড়া'। পরে তথা হইতে কিছুদিন চলিয়া শঙ্করাচার্য্যের জ্যোতির্মঠে (যোশী মঠে) যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বর্ত্তমানে তথায় শঙ্করসম্প্রদায়ও নাই—কোনরূপ জ্ঞানচর্চাও নাই। সেস্থান হইতে বহু পর্ব্বতশৃঙ্গ, কন্দর, নদী, প্রস্রবণ, তুষারাচ্ছন্ন উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া বদরিকাশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানটি প্রায় ৩ মাইল দীর্ঘ ১৷৷ মাইল প্রস্থ একটী উপত্যকা। মধ্যস্থলে অলকানন্দা প্রবাহিতা। তাহার পূর্ব্বপারে ছোট ছোট তিনটী হ্রদ আছে; পশ্চিমপারে বদরীনারায়ণ বিগ্রহ আছেন। গরমের কয়েক মাস দেবপ্রয়াগ হইতে পাণ্ডারা আসিয়া এইস্থানে আড্ডা করে। বদরিকাশ্রম জগতের শ্রেষ্ঠতীর্থ। সুতরাং প্রাণপণ করিয়া যাত্রীরাও এ স্থানে আসিয়া থাকে। তাই অনেক স্থলেই অনেক সহজ ও সরল পথের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম শৃঙ্গদ্বয়কে নর ও নারায়ণ বলে। নর ও নারায়ণ নাকি জগতের কল্যাণার্থ তপস্যা

করিতে করিতে প্রস্তরে পরিণত হইয়া উক্ত স্বরূপরূপে বর্ত্তমান আছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও নাকি নিজকৃত কোন দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তার্থ এই স্থানে তপস্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি অলকানন্দার তীরে ব্রহ্মার কপাল ব্রহ্মকপালি নামে মহাতীর্থরূপে বিরাজ করিতেছে। এই স্থানের যাবতীয় বস্তুর সহিত এইরূপ এক একটী, বা তদধিক বিসংবাদিত প্রবাদ প্রচলিত আছে।

বদরিকাশ্রম হইতে আমরা ব্যাসগুহায় গমন করিলাম। এই গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের মন প্রাণ শীতল হইয়া গেল। প্রকাণ্ড গুহা— অতি মনোরম স্থান। এই স্থানে বসিয়া বেদব্যাস নাকি মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি লিখিয়া ভারতে প্রচারের নিমিত্ত নৈমিষারণ্যে স্বশিষ্য সূতের নিকট প্রেরণ করিতেন।

তথা হইতে আমরা বসুধারায় গমন করিলাম। এই স্থানে প্রায় দুই তিন মাইল উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে প্রকাণ্ড নদীর ন্যায় জলধারা বরফের পাহাড় সকল বহন করিয়া আনিয়া হুড় হুড় করিয়া ফেলিতেছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমরা বহুদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম, তথাপি শীকরসম্পাতে আমাদের গাত্রাচ্ছাদন সব আর্দ্র হইয়া গেল। এই স্থান হইতে আমার সঙ্গী প্রাকৃতিক ভীষণতা সন্দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু আমি আর ফিরিলাম না।

তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় সাহস ও অভাবনীয় উদ্যমে পরিচালিত হইয়া আমি একাকীই তথা হইতে কালিদাসের মেঘদূতবর্ণিত যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী 'অলকাপুর'তে' যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় আর কিছুই দেখা গেল না;—কেবল ধবলতুষারাচ্ছন্ন অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ বেষ্টিত পাদুবোকীর্ণ বৃহৎ অধিত্যকা। বেলা ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত

সূর্য্যের মুখ দেখিলাম বটে ; কিন্তু সেই জৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্ন সূর্য্য, বঙ্গদেশের প্রাতঃসূর্য্য পৌষমাসে যেরূপ কুয়াসা ভেদ করিয়া সামান্য কিরণ বিস্তার করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই প্রগাঢ় মেঘমালা ভেদ করিয়া সামান্য-কিরণ-বিস্তারে তুষার-কবলিত এই মহাশীতার্ত্তকে রক্ষা করিতে না পারিয়া যেন লজ্জায় নিষ্প্রভ হইয়া রহিল। স্থানবিশেষে যে অগ্নিমূর্ত্তি, স্থানান্তরে তাহার আবার এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে।

যাহা হউক সেই নিষ্প্রভ সূর্য্য অন্তরকমে আমার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। তাহার সেই সামান্য কিরণ চতুর্দ্দিকে তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ সকলের উপর পতিত হওয়ায়, সেই শৃঙ্গসমূহ যেন বিবিধমণিমাণিক্যখচিত রাজপ্রাসাদের ন্যায় এক অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়া "সে-ই যে ধনপতি কুবেরের রাজধানী" তাহার পরিচয় দিয়া দিল। আর দূর হইতে যে তুষারধবলিত অধিত্যকাকে প্রকাণ্ড কটাহে ফেণায়মান উষ্ণ দুধের ন্যায় দেখিতেছিলাম,— মেঘসকল যাহার উপর বাষ্পের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল—আমি তখন যাহার উপরে দণ্ডায়মান,— সেই বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি যেন সেই রাজধানীর মর্ম্মরপ্রস্তরবিমণ্ডিত সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বরফে পা আড়ষ্ট হইয়া আসিল। আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিলাম।

কিছু দূরে যাইয়া সম্মুখে একটা হ্রদ দেখিতে পাইলাম; কিন্তু তাহার জলে হাত দিতে ভয় হইল। তথাপি অত্যন্ত পিপাসায় জল পান করিতে গিয়া দেখিলাম, "জল অনীতাহুক — অতিসুবর্ণ।" কি আশ্চর্য্য! চতুর্দ্দিক হইতে বরফ অজস্র গলিয়া পড়িতেছে। সেই

তুষারশীতল জলেই যাহার উৎপত্তি এবং সার্থকনামা হিমালয়েই যাহার অবস্থিতি, সে কিরূপে সুখস্পর্শ হইল ? নদী-জল স্পর্শ করিবার শক্তি অনেক পূর্ব্বেই হারাইয়াছিলাম। এই অলকাপুরী হইতেই অলকানন্দা নদী প্রবাহিত হইয়াছে ;—কিন্তু বসুধারায় পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই নদীর জল আর দেখিতে পাই নাই—নদীর খাদ পর্য্যন্ত বরফে পরিপূর্ণ দেখিয়া তাহার উপর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছি ! পূর্ব্বে উষ্ণ প্রস্রবণও অনেক দেখিয়াছি ; কিন্তু উহা গন্ধকের পাহাড় হইতে উৎপন্ন বলিয়া দুর্গন্ধ ও অত্যুষ্ণ—সুতরাং অপেয় ! সেই হ্রদের জল পান করিয়া দেখিলাম অতি সুস্বাদ ! বসুধারা হইতে বহির্গত হইয়া আর জল প্রাপ্ত হই নাই—পিপাসার সম্বল ছিল একমাত্র বরফ ! তাই স্বাদে স্পর্শে পরিতৃপ্ত হইয়া যথাশক্তি জলপান করিলাম এবং সে স্থান হইতে না ফিরিয়া বরাবর উত্তর দিকে চলিলাম। ভাবিলাম, "প্রকৃতির কি সুন্দর নিয়ম ! চতুর্দ্দিকে বরফের মধ্যে ভীষণ শীতেও মানব ঈষদুষ্ণ জলে হাত পা ভিজাইয়া একটু সতেজ হইতে পারে।

যাহার উপর হইতে বরফ গলিয়া গিয়াছে, সেইরূপ দুই এক খণ্ড প্রস্তর মাঝে মাঝে পাইতাম এবং তাহাই আমার বাঁচিবার উপায় হইত ? না হইলে বরফে হাত পা অবশ হইয়া বরফের উপর পড়িয়াই আমার জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত। বরফের উপর দিয়া নিয়ত চলিতে চলিতে যখন হাত পা অবশ হইয়া যাইত, তখন পূর্ব্বোক্ত এক একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া হাত পা মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিতাম। এইরূপে যখন একটু রক্তের সঞ্চার হওয়ায় হাত পা গরম হইয়া উঠিত, তখন আবার চলিতে আরম্ভ করিতাম। আমার হস্তে প্রকাণ্ড একটী যষ্টি ছিল; তাহার উপর ভর দিয়া তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গে

আরোহণ করিতাম। কখনও বা পদস্খলনে পতিত হইতাম; কিন্তু বরফের উপর দিয়া সর্ সর্ করিয়া উমুখ হইয়া বরফের উপরেই পড়ায় বেশী আঘাত প্রাপ্ত হইতাম না—উঠিয়া আবার চলিতাম। আরোহণকালে আমার এইরূপ পতন অনেকবার হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে আমি একটুও নিরুদ্যম হইয়াছিলাম না; কারণ আমি জানিতাম, "পতনই উত্থানের অন্যতম সোপান।"

এইরূপে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ কৈলাসশিখরের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই কৈলাসশিখর পশ্চিমে 'গঙ্গোত্তরী' হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে 'অলকাপুরী' পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, "শৃঙ্গ বেশী উচ্চ নহে,—প্রায় দুই মাইল উঠিলে উপরেই উত্থিত হওয়া যায়। কিন্তু শৃঙ্গটা প্রায়শই খাড়া।" তাই একবার ভাবিলাম, "উঠিতে পারিব কি?" আবার সাহস হইল "না উঠিবই।" তখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া উহাতে উঠিতে লাগিলাম এবং আশা হইতে লাগিল, হয়ত উপরে উঠিয়াই কৈলাসনাথকে পার্ব্বতীর সহিত দেখিতে পাইব। সেই আশায় উৎফুল্ল হইয়া পিপীলিকাদি যেমন কোন প্রাসাদের গা বাহিয়া উঠিতে থাকে, অথচ তাহার আকর্ষণ হেতু বিচ্যুত হয় না, আমিও সেইরূপ সেই শৃঙ্গের গা বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম, অথচ তাহার আকর্ষণ হেতু আলিঙ্গিতের ন্যায় তাহাতেই লগ্ন হইয়া রহিলাম,—কোনক্রমে বিচ্যুত হইলাম না।

শৃঙ্গের প্রায় উপরে যখন উত্থিত হইলাম, তখন অত্যন্ত আনন্দবোধ হইল; আর, "কি দেখিব, কি দেখিব" ভাবিয়া মনটা অত্যন্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়! উপরে উত্থিত হইয়া দেখিলাম, "প্রায় ৫ক মাইল বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে কয়েকটী চামরীমৃগ মাত্র স্বচ্ছন্দে

চামর দোলাইয়া তাহাদের ক্রীড়াস্থল বরফের উপর বিচরণ করি-তেছে।" তাহারা আমাকে এই জনসমাগম-সম্ভাবনা বিরহিতস্থলে দণ্ড হস্তে এক অদ্ভুত জানোয়ারের ন্যায় সমাগত দেখিয়া ইতস্তত পলা-য়ন করিল। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, "যতদূর উঠিয়াছি, ঠিক তদ্দূর উচ্চ আর একটী শৃঙ্গ পূর্ব্বদৃষ্ট শৃঙ্গের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হই-য়াছে।" তথাপি হতাশ্বাস না হইয়া তাহার উপরেও উঠিতে যাইয়া তিন ধাপ মাত্র উঠিতেই উপরে চাহিয়া দেখি, "আর উঠিবার উপায় নাই;—সে স্থান হইতে শৃঙ্গটা সম্পূর্ণই খাড়া হইয়া উঠিয়াছে এবং এত উচ্চ উঠিয়াছে যে দৈব চক্ষু দ্বারা তাহার শেষ পরিলক্ষিত হয় না। অত উচ্চ উঠিয়াও যখন শৃঙ্গটার উচ্চতা লক্ষ্য করিতে পারি-লাম না, তখন হরপার্ব্বতীদর্শনের আশায় নিরাশ হইতে হইল। কেবল ঊর্দ্ধে যতদূর দৃষ্টি যায়, চাহিয়া দেখিলাম, "শুধু অসীম গগন-মণ্ডল ভিন্ন আর কিছুই নাই।" শেষে বেশ বুঝিলাম, "কেবল বাহিরেই যাহাদের দৃষ্টি নিয়োজিত হয়, তাহাদের দ্রষ্টব্যবিষয় কদাপি নিকটস্থ হয় না।"

বহু দেবমূর্ত্তি, বহু তীর্থস্থান, বহু প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিদর্শন করিয়া এবং ঊর্দ্ধতমদেবদেশে উত্থিত হইবার জন্য অসাধারণ চেষ্টা করিয়া যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তখন আমার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। মনে হইতে লাগিল, "আর উঠিতেও পারিব না,—নামিতেও পারিব না,—এই অবস্থায় এই স্থানেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে।"

কিন্তু—কি আশ্চর্য্য! এইরূপ অবসন্ন অবস্থায় যখন আমি হাত পা

ছড়াইয়া বরফের উপর বসিয়া পড়িলাম, তখন আপনা হইতেই সর্ সর্ করিয়া নামিয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে বাধা দিবার শক্তি আমার ছিল না, দিতে চেষ্টাও করিলাম না—শুধু ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলাম। তখন স্বপ্নাবিষ্টের শূন্যপথে গমনাগমনের ন্যায় ইচ্ছামাত্রে—অনায়াসে আমিও যেন শূন্যপথেই অবতরণ করিতে লাগিলাম। পথের কোন নির্দ্দেশ নাই! কতদিনে কোথায় যাইয়া পড়িব তাহারও স্থিরতা নাই! এই অবস্থায় অনেকক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিতেই দেখি, "এমন একটা স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি যে, যদি দক্ষিণ দিকে পড়ি তাহা হইলে আশ্রয় পাইব, আর যদি অকস্মাৎ বামদিকে একটু সরিয়া পড়ি, তাহা হইলে কোথায় যে যাইব তাহার ঠিকানা নাই। সুতরাং স্থির করিলাম সেই দিনই আমার জীবনের শেষ দিন; তাই ভগবানকে স্মরণ করিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলাম। শেষে সর্ সর্ করিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যে স্থানে যাইয়া পতিত হইলাম, তাহাতে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলাম!

দেখিলাম—একটা পথের ধারে আসিয়া পতিত হইয়াছি; কয়েকজন তিব্বতবাসী কতকগুলি ছাগলের সাহায্যে ছিছিরিতে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়া পুনরায় দেশে ফিরিয়াছে এবং সেই স্থানে বসিয়া আহারাদি করিতেছে।" যে কার্য্য আত্মশক্তির অতীত হইয়া দাঁড়ায়, তাহার জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিলে এইরূপ ফলই হইয়া থাকে।

আমাকে সেই স্থান হইতে সেইভাবে পতিত হইতে দেখিয়া তিব্বতবাসীরা ভীত ও বিস্মিত হইয়া "তুমি কে? কোথা হইতে

আসিয়াছ ?" ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং আমার সেই ভাবে সেই পথে আগমনের কথা শুনিয়া "আমি কেন বাচিয়া আছি" ইহাই তাহাদের নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হইল। তাহারা হিন্দী জানিত। হিন্দী ভাষায়ই অনেক আলাপ করিয়া আমাকে যত্নের সহিত আহারাদি করাইল এবং তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন বুঝিলাম তিব্বতঅঞ্চলে আসিয়া পৌছিয়াছি এবং শুনিলাম যে আর কুড়ি পঁচিশ মাইল হাটিলেই তিব্বতে যাইয়া পৌছান যায়।

তিব্বতবাসীরা বাঙ্গালীসন্ন্যাসীকে বিশেষ ভয় ও ভক্তি করে। তাহাদের ধারণা, —বাঙ্গালী সাধুরা সাধারণ হিন্দুস্থানী সাধুদের মত কেবলমাত্র রুটীখানেওয়ালা নহে—উহাদের ভিতর পদার্থ আছে। আর উঁহারা অনেক আশ্চর্য্য ঔষধ ও যাদু জানে। আমাদের দেশে কামরূপকামাখ্যার ন্যায় তিব্বতদেশে বঙ্গদেশের অনেক নূতন নূতন গল্প গুজব প্রচলিত আছে। "বাঙ্গালী সন্ন্যাসীরা যাদুবিদ্যাবলে মানুষকে ভেড়া করিতে, আবার ভেড়াকে মানুষ করিতে পারে" ইহাই তিব্বত-বাসীদের বদ্ধমূল ধারণা। আমিও নাকি যাদুবিদ্যাপ্রভাবেই সেই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে অবতরণ করিয়াছিলাম এবং সেই জন্যই ভয়, ভক্তি ও কৌতূহলপূর্ণহৃদয়ে তাহারা আমাকে তিব্বতে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছিল। কিন্তু আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না।

বাঙ্গালী সাধুর প্রতি ভয় ও ভক্তির জন্য গাড়োয়ালঅঞ্চলেও আমাকে অনেক পার্ব্বত্যদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অনেকে যাদুবিদ্যা দেখিতে ও শিখিতে চাহিয়াছিল; অনেকে রোগীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া ঔষধ ও ঝাড়া ফুক্ প্রার্থনা করিয়াছিল। কারণ

উহারা রোগপ্রতিকারের ব্যবস্থা হইতে ভূতপ্রেতদিগকেই বেশী বিশ্বাস করিয়া থাকে। "আমি ও সব কিছু জানি না" বলিলেই তাহারা দুঃখিতচিত্তে বলিত "বাঙ্গালীদের এই একটা মহাদোষ; উহারা কাহাকেও কিছু দিতে বা শিখাইতে চাহে না।" তথাপি 'বাঙ্গালীরা যে কিছু জানে না' ইহা তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না। ইহাকেই বলে প্রকৃত কুসংস্কার!

তিব্বতবাসীদের নিকট আমি পূর্ব্বেই বদরিকাশ্রমের পথের পরিচয় অবগত হইয়াছিলাম। তাহারা চলিয়া গেলে আমি বদরিকাশ্রমের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কয়েকদিন পরে বদরিকাশ্রম হইয়া অন্য পথে নানাবিধ পার্ব্বত্য পশুপক্ষীর ক্রীড়া দর্শন করিতে করিতে 'মহা-তপোবনে' যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় একজন সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহার নিকট "মানসসরোবরে" যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

শুনিয়া তিনি বলিলেন "দেখ, বাবা! 'মানসসরোবর' কোথায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। অনেকেই বলে যে, এস্থান হইতে ষোল দিন নিয়ত চলিলে 'মানসসরোবরে' যাওয়া যায়; কিন্তু এই ষোল দিন কোন জনপ্রাণীর মুখ দেখা যায় না; ক্ষুৎপিপাসার শান্তির কোনই উপায় নাই, রাত্রি যাপনের গুহা প্রায়ই মেলে না। এই অবস্থায় সর্বদা বরফের উপর দিয়া চলিতে গেলে চার পাঁচ দিনেই বাঙ্গালীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে। কেহ কেহ অতিকষ্টে কয়েক দিন সেই পথে চলিয়া সামান্য একটা হ্রদ দেখিয়া আসিয়া বলে 'মানসসরোবর' দেখিয়া আসিলাম।" বৃটিশগভর্ণমেণ্টের মতে সেইটাই

নাকি 'মানসসরোবর' ! পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞান আর কত বুঝিবে ! অথচ পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিতদের এত অভিমান যে আমাদের আর্যজ্ঞানকেও অগ্রাহ্য করিতে চায় ! তুমিও কতকটা পাশ্চত্যশিক্ষায়শিক্ষিত ; তাই বুঝি সেই 'মানসসরোবর' দেখিতে চাও।"

এত ভীতিপ্রদর্শনেও আমি সঙ্কল্পবিচ্যুত হইলাম না দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন "আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে আইস।"

আমি অগত্যা তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম। প্রায় অর্দ্ধমাইল আরোহণ করিয়া তিনি আমাকে একটা বৃহৎ গুহার ভিতরে লইয়া গেলেন। তথায় এক দিব্যজ্যোতিঃ সন্ন্যাসী বসিয়া ছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন এবং তাঁহারই শিষ্য পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর নিকট আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইতে চাই" ইত্যাদি সংবাদ শুনিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কি দুঃখের বিষয় ! পড়াশুনা করিয়াও তোমাদের ভ্রম ঘোচে না ! " বলা বাহুল্য, ইতঃপূর্ব্বে উঁহাদের সহিত পড়াশুনা সম্বন্ধে কোন কথাই আলোচিত হয় নাই।

অনন্তর সেই গুরুসন্ন্যাসী আমাকে কিছু বন্দমূল ও জল আনিয়া দিতে আদেশ করিলেন। শিষ্যসন্ন্যাসী অবিলম্বে তাহা আনিয়া দিলেন। আমি তদ্দ্বারা ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিয়া একটু সুস্থ হইলে গুরুসন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "মানসসরোবর' কাহাকে বলে বলিতে পার কি ? "

আমি কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র বিস্ময়ের ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সুতরাং তিনিই বলিতে লাগিলেন "মনসি ভবো মানসঃ, অনুভবঃ ; স এব সরোবরঃ মানসসরো-

বরঃ। কেমন হে! এই অর্থ মনে লাগে? অন্তথাপি বাহ্যিকতীর্থ-যাত্রাদিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।" এইরূপে শাস্ত্রযুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক মানসসরোবরের অতিসুন্দর অনুভবসিদ্ধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আবার বলিলেন, "ইহাই প্রকৃত 'মানসসরোবরে'! এই অনুভব-রূপ মানসসরোবর ডুবিলেই মানব সফলমনোরথ হইয়া থাকে।"

তাঁহার কথাগুলি আমার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে যে কি এক নূতনভাবের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ বর্ণনাতীত। তাঁহার অপরিমেয় অলৌলিক শক্তিতে আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সুতরাং আমার মনকে তিনি যে ভাবে চালাইতে লাগি-লেন, সেও ঠিক সেই ভাবেই চলিতে লাগিল।

সেই দীর্ঘ তীর্থযাত্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত হিমালয়ের বহুস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলাম এবং বহু গুহায় বহু সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলাম; কিন্তু ঐরূপ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ আর একজনও দেখিতে পাইয়াছিলাম না। আর আমাকে আর কেহই সেরূপ অভিভূত করিতে পারিয়াছিল না। সেই মহাপুরুষের বাক্যপরম্পরায় আমার হৃদয়ের সেই অদম্য অনির্বচনীয় তীব্র আবেগ, সাগরে— মহাসাগরে—খরস্রোতা নদীর ন্যায় বিলীন হইয়া অতি প্রশান্তগম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং আমি জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইলাম "যদি তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও অনুভবশক্তি থাকে, তাহা হইলে "সংসারে সন্ন্যাসটাও" পরিহাসের বিষয় নহে—অত্যন্ত গৌরবের বিষয়! তাহাতে এত কৃচ্ছ্রসাধন, কি তীর্থপর্য্যটনাদির কোনই আবশ্য-কতা নাই; কেবল চরম লক্ষ্য ভগবানে স্থির রাখিয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিঃস্পৃহভাবে সর্ব্বদা সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।" সেই মহাপুরুষও আমাকে তাহাই অবলম্বন

করিতে অনেক উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন "যাও, এখন নিম্ন-প্রদেশে যাইয়া অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন কর, তত্ত্ববিচার কর, এবং যথাসাধ্য অজ্ঞসমাজের উপকার কর। তাহার পর ইচ্ছা হইলে, পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

যদিও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে আমার একান্ত অনিচ্ছা ছিল, তথাপি তাঁহার আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তাহারই নির্দ্দিষ্ট মার্গে পরিচালিত হইয়া আমি পুনরায় পূর্ব্বানুসৃত পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে প্রয়াগপর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। কয়েকদিন পরে তথায় আর এক মহাপুরুষকে দেখিয়া মনে হইল "পূর্ব্বে যেন তাঁহাকে কোথায় দেখিয়াছি।" কোথায় দেখিয়াছি তাহা ঠিক স্মরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি কেন যেন তাঁহার সঙ্গ লইলাম। কিন্তু তিনি মৌনী হইয়া রহিলেন এবং কোন ভাবই প্রকাশ না করিয়া দুইদিন পরে কাশীধামে যাত্রা করিলেন, আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

আপনারা হয়ত এইরূপ একটা তর্ক তুলিতে পারেন যে, আমি সেই হিমালয়শীর্ষস্থ মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসীর সঙ্গ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিত্যাগ করিলাম কেন ? না তাঁহারই আদেশে অধ্যাত্মশাস্ত্রঅধ্যয়ন, তত্ত্ববিচার, এবং যথাশক্তি অজ্ঞ সমাজের উপকার সাধনার্থ। তাহা হইলে প্রয়াগ হইতে আবার সেই মৌনী সাধুর সঙ্গ লইতে গেলাম কেন ? যিনি মৌনী, তিনি ত আর সে সব কার্য্যে সাহায্য করিতে পারেন না। আর দেখিবা মাত্রই বা আমি তাহাকে মহাপুরুষ অভিধানে অভিহিত করিতে গেলাম কেন ?

তাহার উত্তরে আমি বলিব "মহাপুরুষমাত্রেরই একটা মোহিনীশক্তি আছে। তাহার প্রভাব মৌনামৌন সকল অবস্থায়ই বিস্তার করিয়া তাঁহারা লোককে যে পথে ইচ্ছা সেই পথেই পরিচালিত করিতে পারেন আমিও তাঁহার মোহিনী শক্তিতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দ্বারাই পরিচালিত হইতেছিলাম। বিশেষ আমার মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, যে মহাত্মা বহুরূপীর ভান করিয়া একবার পূজার দশমীর দিন প্রান্তে সাক্ষাৎ দিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, এই ঠিক তিনি কিনা ?

আর আমার মুখে আসিয়াছিল বলিয়াই আমি তাঁহাকে মহাপুরুষ-অভিধানে অভিহিত করিয়া ফেলিয়াছি! বস্তুতঃ তিনি সেই অভিধানের উপযুক্ত কি না, তাহা আপনারাই বিচার করিবেন; আমিও তাহাই বিচার করিবার অবসর খুজিতেছিলাম।

সেই দিন রাত্রিতেই আমরা কাশীধামে যাইয়া পৌছিলাম এবং বিশ্বেশ্বরের বাড়ীতেই সে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পরের দিন প্রাতে সেই সন্ন্যাসী কমণ্ডলুহস্তে গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন; আমিও তাঁহার সঙ্গ লইলাম।

মণিকর্ণিকার ঘাটে উপনীত হইয়া তিনি স্নানান্তে সন্ধ্যাআহ্নিক সমাপন করিলেন। সেই সুদীর্ঘ বৈরাগ্যের ফলে শেষে সন্ধ্যাআহ্নি-কের প্রতি আমার একটু অনুরাগ জন্মিয়াছিল এবং ছাটিয়া কাটিয়া আমার মত উহার একটা নূতনসংস্করণ করিয়া নিয়াছিলাম। আমি সেই ভাবে তাহা সমাপন করিয়া উপরে উঠিয়া বসিলাম; পরে সেই সন্ন্যাসী উঠিয়া উপরের দিকে চলিলে, আমিও তাঁহার পাছে পাছে চলিলাম।

পথে পাঁচ ছয় বৎসরবয়স্ক একটী অনিন্দ্যসুন্দর বালক সম্মুখে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অত্যন্ত ভক্তিভরে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে গেল। আমার মনে হইল সাধুজী উহাকে অবশ্যই ধরিয়া তুলিবেন এবং মুক্তকণ্ঠে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ধরিয়া তোলা, কি আশীর্ব্বাদ করা ত দূরের কথা, হুঁশব্দে চক্ষুর্দ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া, তিনি তিন চার হাত পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন এবং পাছে আমার উপর আসিয়া পতিত হন, এই ভয়ে আমাকেও পাশ কাটাইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হইল।

অবস্থা দেখিয়া বালকটী চমকিয়া উঠিল এবং সেই নতজানু-অবস্থায়ই বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে সাধুজীর প্রতি তাকাইয়া রহিল। তিনি অত্যন্ত অবহেলার সহিত অন্যদিক দিয়া চলিয়া গেলেন।

সাধুজীর ব্যবহার দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। আর তাঁহার অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হইল না। কিয়ৎক্ষণ বালকটীর প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকায় আমার মনে হইতে লাগিল, "সে যেন সরলতা ও পবিত্রতার স্বভাবসুন্দর প্রতিমূর্ত্তি—পুণ্যের অতি বিমল কোমল চিত্র। কুটিলতা, মালিন্য কি পাপ তখন পর্য্যন্ত তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই; তাহার প্রত্যেক দৃষ্টিতেই অকপট ভক্তি-ভাব বিভাত হইতেছে। আর যাঁহাকে আমি প্রথম দর্শনেই মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম এবং আমার ধারণায় যাঁহার মোহিনীশক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া এই তিন দিন পর্য্যন্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিতেছিলাম,—তিনি কিনা "গঙ্গাস্নানে পবিত্র হইয়া আসিয়াছেন, আর সেই পুণ্যময় বালকের স্পর্শে অপবিত্র হইয়া যাইবেন," এই আশঙ্কায় দেবতুল্য অমন বালকের সেই সভক্তি প্রণাম অগ্রাহ্য করিয়া তিন চার হাত দূরে সরিয়া গেলেন! কি দুঃখের বিষয়! এত স্থূলদৃষ্টি, এত কুসংস্কার, এত সংকীর্ণতা নিয়া লোক সাধু সাজিতে যায়,—আর তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমরা তাহা-দিগকে গুরুপদে বরণ করিয়া আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিতে যাই! ইহা হইতে আর ধর্ম্মের গ্লানি কি হইতে পারে? সন্ন্যাসেও যখন লোকের মনোবৃত্তি এত হীন, তখন হিন্দু-ধর্ম্মের আর উত্থান নাই।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসীর প্রতি আমার যে সন্দেহ

দূর হইল এবং যথাকথিত সন্ন্যাসের প্রতি একটা একান্ত অভক্তি আসিয়া পড়িল। তাই ও সব চিন্তা আর না করিয়া সাদরে বালকটীর হাত ধরিয়া তুলিলাম এবং সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম "খোকা! তোমাদের কোন বাড়ী ?

আমার যত্নে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বালক উত্তর করিল 'আমাদের বাড়ী এখানে নয়; এখানে আমার এক দাদুকে দেখিতে আসিয়াছি—আমি আসিয়াছি, মা আসিয়াছে, বাবা আসিয়াছেন, ঠাকুমা আসিয়াছেন, দাদু আসিয়াছেন—আমরা সকলে আসিয়াছি।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার দাদু কে ?"

বালক মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল "যাহাকে দেখিতে আসিয়াছি ?—সে ত জগদীশবাবু, আর আমার দাদু ত শ্যামচরণ বাবু।

বালকের কথা শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া নিবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার বাবার নাম কি, বলিতে পার ? খোকা!"

বালক সেই ভাবেই উত্তর করিল "বাবার নাম ত নরেশ!"

এবার আমি আরও একটু বিচলিত হইয়া পড়িলাম এবং সস্নেহে বালককে কোলে তুলিয়া নিয়া বলিলাম "খোকা! তোমাদের বাড়ী কোথায়, তাহা ত বলিলে না।"

বালক জবাব দিল "আমাদের বাড়ী ? সে অনেক দূর—শ্রীপুরে।

এবার আমার বুকের ভিতর ধরাস্ ধরাস্ করিতে লাগিল। লোষ্ট্র কেন, যে কোন পদার্থ যতই বেগে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করা

যায় তাহার সেই বেগ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ক্রমশই উত্থিত হয়; তারপর উর্দ্ধে যদি কোন আশ্রয় মিলে, তবে তাহা অবলম্বন করিয়া তথায় থাকিতেও পারে, আর না হইলে সেই বেগ থামিবা মাত্র পৃথিবীর আকর্ষণে আবার আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং যতই নিকটস্থ হয় পৃথিবীর আকর্ষণও ততই বাড়ীতে থাকে। তখন ভয় হয় "কোথায় কি ভাবে যাইয়া পড়িবে এবং তাহাতে সে পূর্ব্ববৎ অটুট থাকিবে, না বিচূর্ণিত হইয়া যাইবে।" মানুষের পক্ষেও ঠিক সেই অবস্থাই হয়;— বৈরাগ্যের বেগে যখন মানুষ সংসার হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন যতদিন সেই বেগ থাকে, ততদিন দূর হইতে দূরতরে চলিয়া যায়; তার পর যদি কোন আশ্রয় পায়, তাহা হইলে সেখানে কিছুদিন থাকিতেও পারে; আর না হইলে, সেই বেগ থামিবামাত্র আবার সংসারের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং যতই নিকটস্থ হয়, সংসারের আকর্ষণও ততই বাড়িতে থাকে। তখন ভয় হয় "সংসারের কোথায় কি ভাবে যাইয়া পড়িবে এবং তাহাতে তাহার হৃদয় পূর্ব্ববৎ অটুট থাকিবে না বিচূর্ণিত হইয়া যাইবে। আমারও ঠিক সেই অবস্থাই হইয়াছিল। ফলে ভয় ও উদ্বেগের প্রবল বন্যা আসিয়া আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। তাই বালককে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম;—'সে কি উত্তর করিয়া বসে' এই আশঙ্কায় ক্ষণকাল আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না;—শেষে আকুল উৎকণ্ঠায় আর থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রভা তোমার কি হয়? খোকা!"

বালক উত্তর করিল "প্রভাত আমার এক পিসী! সেও এখানে আছে!"

বলিলাম "তুমি ত সকলকেই চেন দেখি! আচ্ছা, লীলাকে চেন?

"চিনি না? লীলা ত আমার মা" বলিয়া খোকা হাসিয়া ফেলিল।

বেগরূপে পরিণত বাষ্পের প্রভাবে ষ্টীমইঞ্জিন যখন প্রধাবিত হয়, তখন হইলে, সেই বাষ্পের উচ্ছ্বাস একটু একটু করিয়া উর্দ্ধদিকেই হইতে থাকে; সেইরূপ বৈরাগ্যরূপে পরিণত বিরহের প্রভাবে আমিও যখন প্রধাবিত হইয়াছিলাম তখন হইলে, সেই বিরহের উচ্ছ্বাসটা একটু একটু করিয়া উর্দ্ধদিকেই হইতেছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া আগন্তব্য স্থানে আসিলে, পরে সেই ইঞ্জিনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে সম্পূর্ণ উত্তপ্ত বাষ্প যেরূপ প্রবল বেগে চতুর্দ্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে, সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া আগন্তব্য স্থানে আসিলে, পরে বালকের পরিচয়ে আমার হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় আমারও উত্তপ্ত বিরহটা সেই রূপ প্রবলবেগে চতুর্দ্দিকেই উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। আর সেই প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের গতি যেমন সেই স্থানেই রুদ্ধ হইয়া যায়, আমার গতিও তেমন সেই স্থানেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

তখন সেই বিরহসন্তাপ দূরীকরণার্থ হৃদয়ে ক্রমশই স্নেহবারির সঞ্চার হইতে লাগিল এবং সেই বালককেই তদ্দ্বারা প্রথমে সম্পূর্ণরূপে অভিষিক্ত করিতে করিতে নরেশের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

এমন সময় নরেশ অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং

বিক্ষুব্ধভাবে তৎক্ষণাৎ আমার পদতলে পতিত হইয়া বাষ্পাকুলিত-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "সুরেশ !—ভাই ! আমায় ক্ষমা কর ! —আর একবার তোমাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিবার অধিকার দাও !"

"আরে ! কি কর ! কি কর ! পাগল !" বলিয়া আমি একটু সরিয়া যাইতেই সে আবেগভরে নতজানু অবস্থায়ই বলিতে লাগিল, "ভাই ! তোমার বাক্য বেদবাক্য ! তুমি কথায় যে প্রাণ খুলিতে পার নাই, কাজে সে প্রাণ হরণ করিয়াছ—তোমার কথাই সত্য-তায় পরিণত হইয়াছে—তোমার জন্য আমাকে পাগলই হইতে হইয়াছে ! এত সাধের লীলাকে আমি পাইয়াছি বটে ; কিন্তু তোমাকে হারাইয়া তাহাতে একটুও শান্তি পাই নাই। তাহার সঙ্গে তোমার প্রসঙ্গ জড়িত হইয়া আলিঙ্গনেও বিচ্ছেদ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি, আর ছুটিয়া ছুটিয়া তোমার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছি ; শেষে তোমাকে না পাইয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া কত যে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছি, তাহা কি তুমি বিশ্বাস করিবে ?"

বলিতে বলিতে বস্তুতই নরেশের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া খোকার চক্ষুও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত আকুলভাবে আমার দিকে চাহিতেই পিতাপুত্রের ভাব দেখিয়া আমার সন্ন্যাস-কঠিন হৃদয়ও একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িল এবং অশ্রুসিক্তনয়নে নরেশের হাত ধরিয়া তুলিয়া আমি খোকাকে, তাহার কোলে দিতে যাইতেই, সে আবার বলিতে লাগিল—

"তুমি স্বেচ্ছায় যখন কোলে তুলিয়া নিয়াছ, তখন আর খোকাকে

পরিত্যাগ করিতে পারিবে না; চল, উহাকে নিয়াই আবার ফিরিতে হইবে।"

শুনিয়া খোকাকে নিয়াই আমি নরেশকে জড়াইয়া ধরিলাম এবং উভয়ে উভয়ের বক্ষে কিছুকাল অশ্রুবিসর্জ্জন করিবার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "নরেশ! বাবা মা কেমন আছেন?"

"তা' আর আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? চল, বাসায় যাইয়াই দেখিতে পাইবে," নরেশ এই কথা বলিতেই খোকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! ইনি কে?"

উত্তরে নরেশ বলিতে লাগিল, "ইনি তোর জেঠা মহাশয়;—যে দাতুকে দেখিতে আসিয়াছিস্, তাঁহারই ছেলে। ইনি প্রায় এই সাত বৎসর আমাদের সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন; আর দেখিয়াছিস্ ত, সেই দুঃখে দুঃখে তোর সেই দাতুর কি অবস্থা হইয়াছে?"

"তাহা হইলে যাই, আমি এখনি যাইয়া দাতুকে বলি যে জেঠা মহাশয় আসিয়াছেন", এই কথা বলিয়া খোকা আমার কোল হইতে নামিয়া পড়িল। তাহাতে নরেশ বলিয়া উঠিল, "তোর জেঠা মহাশয় যদি আবার পলাইয়া যান?"

শুনিয়া খোকা থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "না! আর পালাইবেন না! কেমন জেঠা মহাশয়! আপনি কি আর পলাইবেন?"

"না, আমি আর পলাইব না।" আমি এই আশ্বাস দিতেই, "ঠিক যেন পলাইবেন না" আমাকে এইরূপ সাবধান করিয়া খোকা তখনই ছুটিয়া গেল; আমরাও তাহার পশ্চাতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

তখন নরেশ বলিতে লাগিল, "ভাই! তোমার এমন কোমল প্রাণ

যে এত কঠিন হইতে পারিবে, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই, তাই অনেক সময় তোমার সম্বন্ধে অমঙ্গল চিন্তা আসিয়া পড়িয়াছে। তোমার পিতামাতারও সেই কারণে শোকে দুঃখে স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণে আশ্রয় নিয়াছেন। তোমার কি ভাই এত দিনে তাঁহাদের একবারও মনে পড়ে নাই?"

আমি উত্তর করিলাম, "দেখ, ভাই! তোমার আমার ইচ্ছায় জগতের কোন কাজই হয় না;—সকলি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। আমি কি করি?—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি!"

নরেশ এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। বলিল, "হাঁ, জানি, ও সব লেম্ এক্স্‌কিউজ্; আর কোন উত্তর না পাইলে লোকে ঐরূপ উত্তর করিয়া থাকে।

আমি প্রতিবাদ করিলাম, "আরে ভ্রান্ত! রিয়াল ফ্যাক্টকে তুমি লেম্ এক্স্‌কিউজ্ বলিতে যাও! আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে যে সব কার্য্য কারণ নির্ণয় করি, তাহাদের পশ্চাতে যে একটা ঐশী শক্তি অলক্ষিতভাবে কাজ করিয়া যায়, তাহা তুমি আজ পর্য্যন্তও অনুভব করিতে পার নাই?"

তখন নরেশ বলিয়া উঠিল, "ভাই! তোমার ও সব তত্ত্ব কথা রাখিয়া দাও; এখন ফ্যাক্ট যাহা, তাহাই দেখ। ঐ দেখ খোকার নিকট সংবাদ পাইয়া তোমাকে দেখিবার জন্য সকলে আসিয়া বাহির হইয়াছে।

আমি দূর হইতে চাহিয়া দেখিলাম, "প্রভা ও মা বাহিরে আসিয়া আকুলভাবে আমাদের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন; আর

খোকা এক এক বার আনন্দোচ্ছ্বাসে অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে, আর এক এক বার মা ও প্রভার দিকে ফিরিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কি যেন বলিতেছে। তখন আমি নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মায়ের পার্শ্বে দাঁড়ান ঐ প্রভাকে দেখা যায় না?"

নরেশ উত্তর করিল "হাঁ ঐ প্রভাকেই দেখা যাইতেছে। তুমি উহাকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলে, এতদিন ও সেই মন্ত্রের উপাসিকা হইয়াই কুমারীব্রত অবলম্বন করিয়া আছে। প্রভা তোমার উপযুক্তা সন্ন্যাসিনীই বটে!"

নরেশের মুখে প্রভার সেই ভাবের কথা শুনিয়া আমার বক্ষ পবিত্র প্রেমের গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিল এবং ইচ্ছা হইতে লাগিল, তখনি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া এই দীর্ঘতম বিচ্ছেদের স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে চাপিয়া বাহির করিয়া দেই; কিন্তু নিকটে আসিতেই মায়ের দিকে চাহিয়া এমন পরিতাপ আসিয়া পড়িল যে, তাহার কাছে সেই প্রেমগৌরব অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া অবনতমস্তকে আত্মসমর্পণ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে এবং নিকটস্থ হইতেই জড়াইয়া ধরে, সেইরূপ মায়ের অসীম স্নেহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিকটস্থ হইবামাত্র মা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাবা! আসিয়াছিস্! এত দিন পরে কি তোর মায়ের কথা মনে পড়িয়াছে?"

এই কথা বলিতে বলিতে দর্ দর্ ধারে তাঁহার অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল; আমিও আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না! কি বলিয়া তাঁহার কথার উত্তর দিব, তাহাও খুঁজিয়া পাইলাম না; শুধু,

তাঁহার বক্ষে ঢলিয়া পড়িয়া তাঁহার চরণে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।"

তখন অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া খোকা বলিয়া উঠিল, "কেমন দাদু! আমি বলি নাই যে, জেঠা মহাশয় আসিয়াছেন।"

উত্তরে "হাঁ তুই ঠিক বলিয়াছিস্; এখন জেঠামহাশয়কে নিয়া উপরে আয়।" এই কথা শুনিতেই মা আমি, উভয়েই উপরের দিকে চাহিয়া দেখি, বাবা রুগ্নাবস্থায়ই লাঠী ভর করিয়া ঝুলবারান্দায় আসিয়া সাশ্রু নয়নে দাঁড়াইয়া আছেন।"

এদিকে বাবার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্রই, "চলুন জেঠামহাশয়! চলুন এখন উপরে" বলিয়া খোকা আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। মাও আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আয় বাবা, এখন উপরে আয়; ওঁর অসুস্থ শরীরেই উনি আসিয়া বারান্দায় যে ভাবে দাঁড়াইয়াছেন, তাহাতে হয় ত অস্থির হইয়া পড়িবেন।"

বলিতে বলিতে মা আগে আগে চলিলেন, তাঁহার পিছনে হাতে হাত ধরিয়া আমি ও খোকা এবং আমাদের পিছনে অন্যান্য সকলে উপরে উঠিয়া যাইতেই দেখি, "বাবা আবার লাঠী ভর করিয়া আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে ফিরিয়া আসিতেছেন।" দেখিয়া নরেশ তাড়াতাড়ি যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বিছানার উপর নিয়া বসাইল।

আমি যে কত বড় অপরাধ করিয়াছি, তাহার পূর্ণ চিত্র বাবার সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ক্ষীণপ্রাণ দেহেই অঙ্কিত দেখিয়া আমার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং আত্মকৃতশোকে আত্মহারা হইয়া তখনি যাইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া চীৎকার

করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "বাবা, এই মহাপাতকী সন্তানকে ক্ষমা করুণ; সে আর কখনও আপনার অবাধ্য হইবে না।"

বাবা সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশ্বেশ্বর এতকাল পরে কি তোরে সুমতি দিয়াছেন ?"

আমি সেই অবস্থায়ই বলিতে লাগিলাম, "আমি যে কি মহাপাপ করিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষেই দেখিতেছি এবং বেশ বুঝিতেছি "আপনি যদি ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে আমার নরকেও স্থান হইবে না।"

"তুই আমার একমাত্র সন্তান—জীবনসম্বল! তোর অদর্শনে আমার সুখ শান্তি, আশা ভরসা, ঘর-সংসার—সকল গিয়া এই দেখ, আমার শরীরের—"বলিতে বলিতে তিনি আমার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

তখন তাঁহার দিকে চাহিয়া আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। কিন্তু প্রেমবিহ্বলা তরুণীর ন্যায় অনুতপ্ত নিতান্ত অপরাধীরও বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না — দু'নয়নে কেবল অশ্রুধারাই বহিতে থাকে। আমারও ঠিক সেই দশাই ঘটিল; ইচ্ছা থাকিলেও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিলাম না; দু'নয়নে কেবল অশ্রুধারাই বহিতে লাগিল দুর্বল শরীরে বাবা তাঁহার সেই আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। আমি নরেশকে সাহায্যার্থ ইঙ্গিত করিয়া তখনি যাইয়া পিছন হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম; নরেশ একখানা পাখা নিয়া তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল; অন্য সকলে অশ্রুভারাক্রান্তনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুকাল পরে বাবা একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, "সুরেশ, বাবা

যখন আসিয়াছিস্, তখন আর এই বৃদ্ধ পিতামাতাকে ফেলিয়া যাস না।"

বাবার সেই কাতরোক্তিতে আমার যে কি দুঃখ হইল, তাহা আর বলিতে পারি না! কহিলাম, "বাবা, আপনারা আমাকে যাহা বলিবেন, প্রাণ গেলেও, আমি আর তাহার অন্যথা করিব না।"

তখন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াই যেন বাবা মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বেলা অধিক হইয়াছে; যাও, তোমরা এখন কাজকর্ম্ম দেখ। সুরেশ কি খায়, না খায় জিজ্ঞাসা করিয়া ওর খোরাকের ব্যবস্থা করিও।"

"ও আবার খাবে, না খাবে কি? আমরাও যাহা খাই ও-ও তাহাই খাইবে," মা এই মত প্রকাশ করিতেই বাবা আবার বলিলেন, হয় ত তাহাতে ওর খাওয়াই হইবে না; সামিষ নিরামিষ দুই পাক করিও। যেটা দিয়া হয়, ও খাইতে পারিবে।"

তখন আমি বলিলাম, "আচ্ছা আমি সবই খাব এখন।"

খোকা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। আমার কথা শুনিয়া সে একটু মুচ্‌কি হাসির সহিত চোখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "আমিও সবই খাব এখন।"

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাঁসিয়া পড়িল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কি সবই খাবি?"

খোকা সেই ভাবেই উত্তর করিল, "হা! সবই খাব;—মাচ খাব—ডাল খাব—দুধ খাব—মিষ্টি খাব;—সবই খাব।"

বাবা হাসি চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমাকে কিছু দিবি না?"

খোকা নিগ্রহানুগ্রহসমর্থভাবে উত্তর করিল, "দেব, —আপনারে

দেব, জেঠামহাশয়েরে দিব, দাদুরে দেব, বাবারে দেব,— সকলেরে দেব!—মায়েরে দেব না!"

তখন আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। পরে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়েরে দিবি না কেন?"

খোকা প্রতিশোধগর্বিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "সে আমায় কাল বকিয়াছিল কেন?—কেন বকিয়াছিল?"

"তাহা হইলে সেও ত তোকে আর কোলে নিবে না। যাই, আমি যাইয়া তার কোলে উঠি," এই কথা বলিয়া মা একটু জোরে হাটিতেই খোকা তাঁহার পাছে পাছে ছুটিল।

তখন "তোর মায়ের কোলে কে উঠিতে পারে রে? তুই আয়, আমার কোলে উঠিয়া আয়।" হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়া প্রভা তাহাকে সাগ্রহে কোলে তুলিয়া লইয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করিল। আমরা বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

এদিকে শ্যামাচরণবাবু তাঁহার স্ত্রীকে নিয়া আমার কল্যাণে আমারই প্রত্যাগমনার্থ, বিশ্বেশ্বরকে পূজা দিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা দু'জনে এমন সময় ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে? বাবা সুরেশ! আমরা পূজা দিয়া ফিরিবার পূর্ব্বেই তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ? ধন্য বিশ্বেশ্বর! ধন্য তোমার মহিমা! হাতে হাতেই তোমার পূজার ফল পাওয়া যায়! নেও সুরেশ! এই তোমার আশীর্ব্বাদ! বিশ্বেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

আমি বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিলাম; পরে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া আবার বসিলাম।

তখন শ্যামাচরণবাবু আবার খোকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "খোকা! আয় রে আশীর্ব্বাদ নিয়া যা।"

খোকা দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কই! দাদু, কি আনিয়াছেন—প্রসাদ আনিয়াছেন?"

"এই নে তোর আশীর্ব্বাদ, আর এই নে তোর প্রসাদ" এই বলিয়া শ্যামাচরণবাবু বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদ খোকার মস্তকে এবং প্রসাদ তাহার হাতে দিয়া তাহাকে কোলে করিয়া বসিলেন; পরে বাবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেমন, আপনাকে আমি বলি নাই যে, আপনি অত হতাশ হইবেন না; বিশ্বেশ্বরকে ডাকুন;— সুরেশ নিশ্চয়ই আবার ফিরিয়া আসিবে। দেখুন, আমার কথা সত্য হইল কিনা? আপনি ত কালকেই উইল লেখাপড়া করিতে চাহিয়াছিলেন।

বাবা উত্তর করিলেন, "হাঁ, বিশ্বেশ্বরকে ডাকার ফল তিনি দিলেন বটে, কিন্তু না কাঁদাইয়া দিলেন না; সেই জন্যই মন স্থির রাখিতে পারি নাই। সুরেশ যে বাচিয়া আছে, আমার এই ধারণাই ত লোপ পাইতে চলিয়াছিল।

শুনিয়া শ্যামাচরণবাবু বলিতে লাগিলেন, "কেবল আপনার কেন অনেকেরই মনে ঐরূপ একটা আশঙ্কা আসিয়া পড়িয়াছিল; দেখ সুরেশ! তোমার ও সব পাগলামি এখন পরিত্যাগ কর। দেখিয়াছ ত, উহার ফলে তোমার পিতামাতার কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে? এখন রীতিমত সেবাশুশ্রূষা করিয়া যাহাতে তাঁহাদের শরীরটা সারিয়া তুলিতে পার, তাহার চেষ্টা কর। প্রায়শই দেখা যায়, জীবিত অবস্থায় পিতামাতা যে কি জিনিষ, লোকে তাহা বোঝে না; তাই তাঁহাদের মনে অনেক সময় কষ্ট দিয়া থাকে। মৃত্যুর পরে যখন তাঁহাদের গৌরব বুঝিতে থাকে, তখন ক্রমশই অনুতাপ আসিতে থাকে; আর শ্রাদ্ধতর্পণাদির ব্যবস্থাবাহুল্যদ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে যায়। কিন্তু

তাহার ফলাফল সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ বলিয়া, আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বোঝা উচিত যে, জীবিতাবস্থায় পিতা-মাতার গৌরব বুঝিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহাই সার্থক—প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ হয়। মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান জান ত? প্রাণিহিংসাদি শতপাপসত্ত্বেও কেবলমাত্র পিতামাতার সেবাশুশ্রূষাদ্বারা সে ত্রিকাল-দর্শী মহাপুরুষ হইয়াছিল। মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব উহাদ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা-ইয়া দিয়াছেন যে, পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা হইতে বড় ধর্ম্ম জগতে আর কিছুই নাই এবং তাহার ফল পাইতে হইলে জীবিতাবস্থায়ই সেই সেবাশুশ্রূষা করিতে হয়।"

শুনিয়া বাবা আক্ষেপ করিলেন, "আজকালকার দিনে মহাভারতের কথায় আর আদর নাই! পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এখন সকলে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিতে শিখিয়াছে; তাহা হইতে আর কৃতজ্ঞতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন কি হইতে পারে?"

শ্যামাচরণবাবু অত অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আজকালকার বাবুরা নিজেরাই এক একটা স্মৃতিস্তম্ভ ত নয়, কীর্ত্তিস্তম্ভ। সুতরাং আব ভিন্ন স্তম্ভসংস্থাপনেরই বা দরকার কি? শুধু তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলেই হইল; আপনারা তাঁহাদের নিকট আর কিছুই চাহিতে পারিবেন না। কিন্তু কেবল বাবুরা কেন, তাঁহা-দের ছেলেপিলেরা পর্য্যন্ত যাহা চাহিবে, তাহা দিতেই হইবে।"

শুনিয়া নরেশ আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল; কিন্তু আমি ম্রিয়-মাণ হইয়া রহিলাম।

খোকা এতক্ষণ বসিয়া একমনে মিঠাই খাইতেছিল এবং সহাস্যবদনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাহার আনন্দটা প্রকাশ করিতেছিল।

এবার যেমন মিঠাইও ফুরাইয়া গিয়াছিল, তেমন তাহার দাদামহাশয়ের শেষ কথাটাও কানে গিয়াছিল ; তাই সে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, দিতে হইবেই ত— সন্দেশ দিতে হইবে, রসগোল্লা,—পানতোয়া— আরও কত দিতে হইবে।"

খোকার ঐ জাতীয় দাবীর কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া পড়িল; পরে শ্যামাচরণবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই আমাদের কি দিয়াছিস্, যে তোকে আমরা কত দিব ?"

উত্তরে খোকা ক্ষুব্ধভাবে অনুযোগ দিল "কেন? আমি জেঠা মহাশয়কে আনিয়া দেই নাই?"

"হাঁ, তুই ত আনিয়া দিয়াছিস্। সে জন্য তুই যা চাস্, তোরে তাই দিব। তুই আয়, আমার কোলে আয়" বলিয়া বাবা খোকাকে ডাকিতেই সে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বাবার কোলে যাইয়া বসিল।

তখন আমি শ্যামাচরণবাবুর নিকট খোকার সম্পর্কে সকাল বেলার ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলাম। শুনিয়া শ্যামাচরণবাবু প্রথমে খোকার কার্য্যে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন; পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "দেখ, বাবা সুরেশ! তোমাদের আমরা যাহাই বলি, আমাদের অত্যন্ত [illegible]ক্ষেপ হয় বলিয়াই বলি। একটী সন্তান জন্মিলে কত আশা, কত ভরসায় বুক বাঁধিয়া লোকে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে ;—আর সেই সন্তান যদি কথার অবাধ্য হইয়া সেই আশা ভরসা সব নির্ম্মূল করিতে বসে, তখন যে কি কষ্ট হয়, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে বুঝিতে পারা যায় না। ভগবানের ইচ্ছায় এখন বিবাহাদি কর;

তারপর যদি সন্তান হইয়া তাহারা বড় হয় তখন বুঝিতে পারিবে। তাই আমাদের ওসব কথাবার্ত্তায় অসন্তুষ্ট হইও না।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। বলিলাম "আপনারা ত আর মিথ্যা কিছু বলিতেছেন না যে অসন্তুষ্ট হইব; আর আমি যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, তাহা যদি আপনারা ঐরূপ সাধারণ তিরস্কার করিয়াই ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমার উপরে অসীম অনুগ্রহই প্রকাশ করিলেন মনে করি।"

আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন "এখন বেলা অধিক হইয়া গিয়াছে; এদিকে রান্নাও হইয়া গিয়াছে। আপনারা স্নান করুন। নরেশ! তুমি সুরেশকে নিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া আইস।"

তখন আমরা সকলে স্নানাহ্নিকের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলাম। পরে আহারান্তে সে দিনটা বিশ্রম্ভালাপেই কাটাইয়া দিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

পরে এক দিন রাত্রে আহারান্তে আমি ও নরেশ যাইয়া নরেশের শুইবার ঘরে বসিলাম। কিছুকাল পরে লীলা ও প্রভা আসিয়া সেই ঘরে পান সাজিতে বসিল। তখন আমি নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার সন্ন্যাস ত স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই ছাড়াইলেন, দেখিতেছি; এখন তোমার সন্ন্যাসটা কে কি ভাবে ছাড়াইল বল দেখি।"

"আর আমার সন্ন্যাসটা—তা আমার বিশ্বেশ্বরীই ছাড়াইয়াছেন; তাঁহার অনন্ত লীলার সে ত সামান্ত একটা মাত্র" বলিয়া নরেশ যে ভঙ্গী করিল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ আসর জমিয়া গেল।

আমি হাসিয়া কহিলাম "আচ্ছা, সেইটাই কিরূপ, বল না।

সে লীলাময়ীর লীলা সর্ব্বত্রই একরূপ!

সে রূপটা কোন্ রূপ?

"তাহা আমার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ দিকে চাহিয়া দেখিলেই পার" বলিয়া নরেশ লীলার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল।

তখন লীলা নরেশের দিকে চাহিয়া নয়নকোনে একটু কৃত্রিম কোপ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল "ওঁরে আর এ রূপ দেখাইতে হইবে না; উনি অনেক দিন পূর্ব্বেই ইহা ভাল করিয়া দেখিয়াছেন।"

শুনিয়া নরেশ বলিল "উনি ভাল করিয়া দেখিলে কি আর ছাড়াইতে পারিতেন? আর দেখিয়া থাকিলেও সে ত বাল্যলীলা! —আর এ যে যৌবনলীলা!

লীলা জবাব দিল, "সকলে কি আর তোমার মতন? উনি বাল্যলীলা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর তুমি বাল্য, কৈশোর, যৌবন ইত্যাদি যত লীলাই দেখিতেছ, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে—আর ততই বেশী জড়াইয়া পড়িতেছ!"

নরেশ প্রত্যুত্তর করিল "তোমরা যে ভাবে জড়াইয়া থাক, তাহাতে না পড়িয়া নিস্তার নাই।" পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "সুরেশ, তোমার সেই ঘুড়ীখেলা মনে আছে ত? ঘুড়ি যতই দূরে যাক্ না, যখন নাটাইচক্র তাহার মিলনসূত্রটী গুটাব ত না—জড়াইতে থাকে, তখন সে কি আর না পড়িয়া নিস্তার পায়?"

আমি সমর্থন করিলাম "হাঁ, তা বটেই ত! আর তুমি ত ওস্তাদের হাতে পড়িয়াছ, তাহাতে আর দুঃখ কি?"

শুনিয়া লীলা ব্যঙ্গ করিল "আর কে-ই বা অনোস্তাদের হাতে পড়িয়াছ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কেমন?"

লীলা উত্তর করিল "তা নয় ত কি? আপনি যার হাতে পড়িয়াছেন, সেই ত প্রকৃত 'নাটাইচক্রগুটানী'—প্রকৃত ওস্তাদ! আমি ত দিনের আলোতে ঘুড়ী উড়াইয়াছি এবং দিনের আলোতেই তাহার জড়া ছাড়াইয়া বেশী দূরে মন যাইতেই, ভয়ে ভয়ে তাহা গুটাইয়া ফেলিয়াছি। আর আপনি যাহার হাতে পড়িয়াছেন,

সে এমনি ওস্তাদ যে, নিশার আঁধারে ঘুড়ী উড়াইয়া নিশার আঁধারেই তাহার জড়া ছাড়াইয়া সম্পূর্ণ নির্ভয়ে এত দূরে চালাইয়া দিয়াছিল যে, আমরা সকলেই তাহার বিষয় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সে নিজে বুক পুরু করিয়া সেই সূক্ষ্ম সূত্রটী ধরিয়াই বসিয়াছিল; এখন ঠিক অবসর মতেই তাহা আস্তে আস্তে গুটাইয়া ফেলিয়াছে।"

শুনিয়া নরেশ "ওয়েল্ ডান্, ওয়েল্ ডান্! মাই ডিয়ার হাফ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া রহিলাম।

প্রভা লীলার এই মন্তব্যের প্রারম্ভ হইতেই একটু কোপন-একটু বক্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। ক্রমে তাহার গণ্ড-স্থল আরক্ত হইয়া উঠিল; শেষে নরেশের পূর্ব্বোক্ত শ্লেষপূর্ণ প্রশংসাবাদের সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। অমনি লীলা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং আস্তে হাসিয়া বলিল, "ওস্তাদ জী চলিলে যে? ঘুড়ীখানা ফেলিয়া যাও কেন?"

নরেশের ছোট খোকা আমাদের পার্শ্বেই ঘুমাইতেছিল। এই গোলমালে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। প্রভা সেই ফাঁকে বলিয়া উঠিল "বুড়াকালে আর ওস্তাদি করিতে হইবে না; এ সব ছাড়িয়া এখন খোকাকে ধর গিয়া।"

"ওকে তুমিই নিয়া আস না; দেখি, তোমার কোলেই বা কেমন দেখায়!" লীলা এই কথা বলিতেই "না আমার কোলে ও সব ভাল দেখায় না,—আমি নিয়া আসিতে পারিব না" বলিয়া প্রভা লীলার হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তখন ও ঘরে আমার আর অপেক্ষা করা সঙ্গত না, মনে করিয়া আমিও আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলাম।

পরের দিন সকাল বেলা উঠিয়া শ্যামাচরণবাবু তাহার স্ত্রী ও মাকে সঙ্গে নিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। নরেশও বাজার করিতে বাহির হইল। এমন সময় দেখি "খোকা এক একবার সামনের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া আবার ফিরিতেছে, আর লীলা "শুনিয়া যা খোকা—শুনিয়া যা" বলিয়া কোপনদৃষ্টিতে একটু অগ্রসর হইতেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে।" তাহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইল "নিশ্চয়ই খোকা একটা কিছু দুষ্টামি করিয়া পলাইয়াছে।"

তখন আমি একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অগ্রসর হইলাম এবং "কি রে খোকা! কি হইয়াছে?" জিজ্ঞাসা করিতেই "ঐ দেখুন, মা আমারে মারিতে আসিতেছে" বলিয়া খোকা আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। লীলা পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল।

আমি খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুই কি করিয়া আসিয়াছিস রে? খোকা!"

খোকা প্রতিশোধগর্বিতমুখভঙ্গীর সহিত উত্তর করিল "যেমন মা আমাকে আয়না দিল না, তেমন আমি তার বাক্সের ভিতর থেকে এই বইখানা নিয়া আসিয়াছি।"

"দেখি, কি বই?" বলিয়া বইখানা আমি দেখিতে চাওয়ামাত্র খোকা নিরাপত্তিতে উহা আমার হাতে দিল। তখন উহা খুলিয়া দেখি "উহার ভিতরে দু'খানা চিঠি ও কয়েকটা গান লেখা আছে। গান ক'টার দিকে প্রথমে চক্ষু পড়ায় তাহা আর না

পড়িয়া পারিলাম না ; —পড়িয়া বেশ একটু স্ফূর্ত্তিও পাইলাম। তাহার একটু ভাগ না দিলে হয়ত আপনাদের স্ফূর্ত্তির প্রাণে ব্যথা পাইবেন ; তাই উহার দু'একটা নমুনা দিতেছি, আর অনুরোধ করিতেছি গাওয়াইতে পারিলে ত ভালই, না হইলে অন্ততঃ আপনাদের প্রেয়সীর খাতায় উহা যথাবৎ লেখাইয়া রাখিবেন—

পূর্ব্বরাগ।

জানি না, কি যে প্রাণে চায়!
থেকে থেকে মেতে উঠে,
বুঝিবা মজায়!

কত খেলি কত হাসি ;
কত লোকে ভালবাসি ;
তবু যেন দিবানিশি
কোথা প্রাণ ধায়! (জানিনা)

কত দেখি কত শুনি ;
কত ভাবে হৃদয় খানি
পূরি ভাবি ; কি, না জানি,
শূন্য রয়ে যায়! (জানিনা)

মিনতি।

এসে দেখা দিয়ে, কেন ফিরে চলে যাও ?
নিজেই আসিলে যদি, কেন বা পলাও ?
আশার ছলনে ছ'লে, এভাবে আমায় ফেলে,
এতদিন কোন প্রাণে,—কেন দুঃখ দাও ?

"যে তাপে তাপিত আমি" জেনেও, জান না তুমি;
এখনো কি ফাঁকি দিতে চাও?
তুমিই হৃদয় খুলে, দেখ "কি আগুন জ্বলে";
পুড়ে যাবে, যদি নাহি পরশে নিবাও। ইত্যাদি, ইত্যাদি!

এখন জিনিষটা যে কি পাইয়াছিলাম, তাহা এই নমুনা দ্বারাই বুঝিয়া নিবেন। আমি ত তত্ত্ববিচারের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি, কিন্তু বিচার করিতে যাইয়া, এটা যে কোন তত্ত্ব—আদি, না অধ্যাত্ম, তাহা আজ পর্য্যন্তও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। যাহা হউক সে বিচারের ভার আপনাদের উপর দিয়া আমি চিঠি দু'খানা এখন না দেখিয়া পারিলাম না; আপনারাও আমার চোখে উহা দেখিয়া যাইবেন।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল।
কাশীধাম।
১লা আশ্বিন।

লীলা, (১)

জানি না "তোমায় এখন কি বলিয়া সম্বোধন করিব।" এমন এক দিন আসিয়াছিল, যখন তোমাকে 'প্রিয়তমে' বলিয়া সম্বোধন করিবার অধিকারও প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং করিলে তাহাতে অতিশয়োক্তি হওয়া দূরের কথা, স্বভাবোক্তিও হইত কিনা সন্দেহ। যদিও আজ তুমি আমার নিকট ততোধিক প্রিয়তমা হইয়া আছ, তথাপি আমি তদ্রূপ সম্বোধনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

তুমি সে দিন "আপনি যদি অন্তর্যামী হইতেন" ইত্যাদি বলিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছিলে; আমি আজ "তুমি যদি অন্তর্যামিনী হইতে,—অথবা আমিও যদি অন্তর্যামী হইতাম, একমাত্র তাহা হইলেই মনটাকে কতকটা

প্রবোধ দিতে পারিতাম" বলিয়া পরিতপ্ত হইতেছি। আর তুমি সে দিন "আমার অন্তরের ভাষা, যদি আপনি বাহিরে পাঠ করিতে পারিতেন" ইত্যাদি বলিয়া অতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলে; আমি আজ "আমার অন্তরের ভাষা যদি তুমি বাহিরে পাঠ করিতে পারিতে, অথবা তোমার অন্তরের ভাষা আমিও যদি বাহিরে পাঠ করিতে পারিতাম" বলিয়া অনুতপ্ত হইতেছি। অথচ একথা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না যে, অন্তরের ভাষা অন্তরেই পাঠ করিতে হয়, বাহিরে পাঠ করা অত্যন্ত সুকঠিন।"

তুমি নাকি আমাকে দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় আমার হাতের ঘুড়ীটা ধরিয়াছিলে; আর আমি আজ তোমাকে দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় এই লেখনী ধরিয়াছি। তুমি একবার যে রূপ দেখাইয়াছিলে আবারও যদি সেই রূপ দেখাইতে পার, তাহা হইলে একবার চাহিয়া দেখিব, আর না হইলে, আমি আর ফিরিব না।

তুমি সুরেশকে বন্ধুত্বের কথাটা বিস্মৃত না হইতে অনুরোধ করিয়াছিলে, আমি তাহাকে ওটা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে অনুরোধ করিতেছি। ইতি।

হতভাগ্য—

নরেশ।

(২)

চুঁচুড়া, হুগলী

৬ই আশ্বিন।

প্রাণাধিকাসু—

লীলা, হতভাগিনী! তোদের অবস্থার কথা জানিয়া আমি যে কতদূর দুঃখিত হইয়াছি, সামান্য পত্রে তাহার আর কি জানাইব

পূর্ব্বে যদি তোরা কেহ আমাকে এ কথা জানাইতিস্ তাহা হইলে কোন বিভ্রাটই ঘটিত না।

যাহা হউক, নরেশের ঠিকানা জানাইয়া এবার বুদ্ধিমতীর কাজই করিয়াছিস্। এখন দেখা যাইবে "তোদের ইচ্ছা পূর্ণ করা যায় কিনা!" তবে পূজার বন্ধের পূর্ব্বে আর কিছুই করা যাইবে না। সেই সময় তোর দাদাবাবু বাড়ী আসিলে, যে ভাবেই হউক ঘটনাটা করাইতে হইবে। আমরা সকলেই ভাল আছি। ভগবান্ তোদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। ইতি।

চিরহিতাকাঙ্ক্ষিণী—
তোদের দিদি বা বৌদিদি।

আপনারা সবই ত দেখিলেন। এখন বোধ হয় এ তত্ত্ব বিচারে আপনাদের আর বড় বেগ পাইতে হইবে না; সুতরাং আমি ওসব বন্ধ করিয়া রাখিলাম।

খোকা কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। "কৈ আমার বই দন, জেঠামহাশয়" বলিয়া সে বইখানা নিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আমাকে নিবিষ্টমনে উহা পড়িতে দেখিয়া সে যেন কি আশঙ্কা করিল; তাই বইখানা আবার হস্তগত করিবার জন্য শেষে বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিল।

আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম "দেখ, খোকা! আমার কাছে বইখানা থাকিলে, তাহাতে তোর কোন ভয়ের কারণ নাই; বরং তোর মা উহা ফিরিয়া পাইবার জন্য তুই যাহা চাস্, তাহাই দিয়া তোকেই আবার খোসামোদ করিবে। আর তোর হাতে বই দিলেই তোর মা উহা কাড়িয়া নিবে এবং শেষে তোকেই আবার গালাগালি করিবে।

কাজেই তোর মাকে আক্কেল দিতে হইলে উহা আমার কাছে থাকাই ভাল।"

খোকা এ পরামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া বইখানা আমার কাছেই রাখিয়া দিল। আমি উহা একটা গুপ্তস্থানে রাখিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলাম। খোকা বাবার কাছে বসিয়া খেলা করিতে লাগিল।

সে দিন খাওয়া দাওয়ার পরে সেই বইখানা হাতে করিয়া আমি নরেশের ঘরে যাইয়া বসিলাম এবং কথোপকথনচ্ছলেই নরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম "ভাই কালকে তোমরা তোমাদের যে সব কীর্ত্তিকলাপ গোপন করিয়াছিলে, আজ খোকা তার সবই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।"

শুনিয়া নরেশ কহিল "কীর্ত্তিকলাপ কি? — আমাদের সবই লীলা খেলা।"

আমি কথাটা তাহার মতেই সংশোধন করিয়া বলিলাম "আচ্ছা তাই হউক! তোমাদের গুপ্ত লীলাখেলা সবই সে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।"

কথাটার যে কোন গুরুত্ব আছে, নরেশ তাহা ধারণা করিতে পারিল না। সে উপহাস করিল "খোকাখুকীরা ত সকলেরই গুপ্ত লীলাখেলা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাতে আর একটা বিশেষ কি আছে? সে দিন বাবা যে কথাটা বলিয়াছিলেন, তাহা কি মিথ্যা যে, ছেলেপিলেরা নিজেরাই এক একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু তিনি 'আজকালকার' এই বিশেষণটা দিয়া একটু অর্থসঙ্কোচ করিয়াছিলেন। তাঁহার বলা উচিত ছিল, "চিরকালই ছেলেপিলেরা নিজেরাই এক একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ, কারণ তাহাদের ভিত্তিসংস্থাপনাবধিই পিতামাতার গুণকীর্ত্তি সব বিঘোষিত হইতে থাকে।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম "তোমার ওসব বাজে কথা রাখিয়া দাও। এখন বল দেখি, তুমি আমাকে বন্ধুত্বের কথাটা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে অনুরোধ করিয়া ছিলেকেন? আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যাহাতে তুমি আমার সম্বন্ধে ঐরূপ কথা লিখিয়া ফেলিলে? যে অন্তঃকরণ এত অল্পদিনে—এত সহজেই বিকৃত হইয়া যায়, তাহার সবলতা, সহিষ্ণুতা ও উপেক্ষাশক্তির গর্ব্ব চিরদিন করিয়া আসিতে তোমার যে একটুও লজ্জাবোধ হইল না, এইটাই আশ্চর্য্য!"

আমার কথা শুনিয়া নরেশ বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল—কথাটা যেন ঠিক ধরিয়াও ধরিতে পারিল না।"

নিজের অন্যায় নিজে সহসা কেহ ধরিতে পারে না, ধরিতে পারিলেও সহজে সেটা স্বীকার করিতে চাহে না। ফলে আপনা হইতে যখন প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন অন্যায় ও মিথ্যার অপরাধে দ্বিগুণ অপরাধী হইতে হয়। তাই নরেশকে বুঝাইয়া বলিলাম, দেখ ত, কাশীধাম-ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে লীলার নিকট এ কি লিখিয়াছিলে?" বলিয়া সেই চিঠিখানা তাহার হাতে দিলাম।

দেখিয়া নরেশ লজ্জা ও সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। কিছু কাল কোন উত্তর করিতে পারিল না, কেবল অনুতাপে তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল; পরে অত্যন্ত কাতরতার সহিত বলিতে লাগিল "হাঁ, ভাই! বস্তুতই তোমার নিকট আমি চির-অপরাধী এবং শেষে তজ্জন্য নিতান্ত অনুতপ্ত হইলেও আমার স্বভাব অনুসারে এখন পর্য্যন্ত অকপটভাবে তাহা স্বীকার করিতে পারি নাই—করিবার অবসরও প্রাপ্ত হই নাই; তাই ভগবান্ আমাকে এই সুযোগ জুটাইয়া দিয়াছেন। আমার সম্বন্ধে তুমি যখন যাহা বলিয়াছ, তাহার এক বর্ণও

মিথ্যা নয়। আমি এই এক কথা লিখিয়া যে কেবল একটা মাত্র অন্যায় করিয়াছি তাহা নয়, পূর্ব্বে আরও অনেক সময় আত্মগোপনে করিয়া বন্ধুত্বের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি; কিন্তু তুমি বরাবরই তাহা ক্ষমা করিয়া প্রকৃত বন্ধুর কাজই করিয়া আসিতেছ। আজও আমার নিকট এ কথা গোপন না করিয়া স্পষ্টতঃ জিজ্ঞাসা করায় আমার এই অপরাধের অর্দ্ধেকটা ক্ষমা করিয়াছ; অপরার্দ্ধের জন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া একান্তভাবে অনুরোধ করিতেছি যে, বুদ্ধির ভ্রমে ভবিষ্যতে যদি আবার কোন অন্যায় করিয়া বসি, তবে তাহাও এই ভাবে সংশোধন করিয়া আমাকে তোমার বন্ধুর উপযুক্ত করিয়া লইও।"

তাহার সেই কাতরোক্তিতে আমার অত্যন্ত দয়া হইল; বলিলাম, "হাঁ, তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি, যদি ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও, আর যদি খোকার এই সামান্য অপরাধের জন্য তাহাকে তোমরা কিছু না বল।

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল "খোকার অপরাধটা কি?— সে কি করিয়া তোমার নিকট এসব প্রকাশ করিল?"।

তখন খোকার অপরাধের বিষয় আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। পরে নরেশ বলিতে লাগিল "খোকার অপরাধের বিষয় ইহাতে কিছুই নাই; আমার অপরাধ সংশোধনার্থ স্বয়ং ভগবানই এ ঘটনা ঘটাইয়াছেন। একজন্য খোকাকে কেহই কিছু বলিবে না। তবে তোমার নিকট একটা অনুরোধ করিতেছি—তুমি এ কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইবে।"

"আচ্ছা, তাহা পরে দেখা যাইবে বলিয়া" আমি সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মানুষ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পরিমিত অদৃষ্ট নিয়া জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং তাহাতেই যতটা সুখশান্তির অধিকারী হওয়া যায়, ততটাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তাহা না হইয়া অতিরিক্ত কিছু চাহিতে গেলেই, সে বাধা প্রাপ্ত হয়। তাহাতে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া তজ্জন্য জিদ ধরিয়া বসিলে, যাহার যতটা অধিকার আছে তদতিরিক্ত সামগ্রী বলপূর্ব্বক ধরাইতে গেলে, যেমন হয় সেই পাত্রটাই বিদীর্ণ হইয়া যায়, আর না হয় পূর্ব্বাধিকৃত সামগ্রীর অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে থাকে, তেমন হয় তাহার নিজের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, আর না হয় ক্রমশই পূর্ব্বপ্রাপ্ত সুখসামগ্রীর অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে থাকে। এক্ষেত্রে নিজের অধিকার বাড়াইয়া নিবার জন্য প্রথমেই দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; তাহা না করিয়া পুরুষকারবলে যেই লোক অতিরিক্ত একটা ধরিয়া বসে, সেই দৈব তাহার অন্য একটা কাড়িয়া নিয়া নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করে।

আমার পক্ষেও ঠিক তাহাই ঘটিল। মার শরীর ক্রমশই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বিশেষ কোন অসুখ না থাকিলেও এমন একটা অরুচি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, যে তিনি কিছুই খাইতে না পারিয়া দিন দিন অত্যন্ত কৃশ হইয়া যাইতে লাগিলেন। পরে একটু অসুখ দেখা দিল। তখন তাঁহার জীবনের প্রতি সকলেরই একটা আশঙ্কা

অস্থায়, একজন বহুদর্শী চিকিৎসক দ্বারা ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করাইয়া তাঁহাকে আমরা যথাবিধি ঔষধাদি সেবন করাইতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল না;— ক্রমশই তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া শেষে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তখন আমরা সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে প্রভা সকলের চেয়ে বেশী শোকাতুর হইয়া পড়িল। সে আহারনিদ্রা একরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার গায়ে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে এবং "এখন কেমন আছ মা? তোমার কি খাইতে ইচ্ছা হয়? তোমাকে কি দিব?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া মায়ের অন্তিম স্নেহটুকু কাড়িয়া নিতে লাগিল। মাও, সে একটু সরিয়া গেলেই, "প্রভা গেল কোথা? প্রভা! প্রভা!" বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন। আর আমি প্রভার ন্যায় অতটা করিয়া উঠিতে না পারিলেও সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতাম; তিনিও আমাকে চোকের আড়াল হইতে দিতেন না।

এইরূপ অবস্থায় একদিন বৈকালে তিনি সকলকে ডাকিলেন। সকলেই নিকটস্থ হইলে তিনি বাবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তুমি আসিয়া আমার শিয়রে একটু বস, আর ওঁদের সব ঐখানে বসিতে দাও।" তদনুসারে বাবা তাঁহার শিয়রে এবং শ্যামাচরণবাবু প্রভৃতি তাঁহার বিছানার পার্শ্বে অন্য আর একটা বিছানায় যাইয়া বসিলেন।

তখন মা আবার বাবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমার অন্তিমকাল উপস্থিত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। তোমার ও সুরেশের সম্মুখে এই কাশীধামে যদি আমার দেহত্যাগ হয়, আমার পক্ষে তাহা হইতে আর বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? তথাপি এ

মরণে আমি শান্তি পাইতেছি না! তোমার হাতে পড়িয়া এ জীবনে সুখ-শান্তি যতদূর সম্ভব ভোগ করিয়াছি ; তাহার জন্য কোন দিন কোন প্রার্থনা করিতে হয় নাই—তুমি স্বেচ্ছায় সকলই দিয়াছ। এখন এই অন্তিম সময়ে একটামাত্র প্রার্থনা করিব ; তাহা পূরণ করিয়া যাহাতে আমি মরণেও শান্তি পাই, তোমার তাহা করিতেই হইবে।"

মার কথা শুনিয়া বাবা একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত করুণকণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এমন কি প্রার্থনা আছে যাহার জন্য তুমি এত করিয়া বলিতেছ?"

"যাহাই থাকুক্ তুমি নিরাপত্তিতে পূরণ করিবে, এ অঙ্গীকার আগে কর; তার পর আমি বলিতেছি" মা এই কথা বলিতেই বাবা, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার এই প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ করিব" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন।

তখন মা, বাবা শ্যামাচরণবাবু প্রভৃতি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনারা সকলেই শুনুন, আমার নিজের জীবনে আমার সকল অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহাতে কোনরূপ অশান্তির কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু যাহারা আমার জীবনের জীবন, তাহাদের একটা একান্ত অভিপ্রায় পূর্ণ না হওয়ায় তাহাদেরই অশান্তিতে আমিও অনেক দিন অশান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছি। তাহাদের সে অশান্তি দূর করিতে না পারিলে মৃত্যুর পরেও আমি শান্তি পাইব না। সে বিষয় কর্তামহাশয়ের নিজেরই একান্ত অমত জানিয়া আমি এতদিন জোর করিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করি নাই, অথচ বলিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি। আজ আমার জীবনের শেষ দিনে ভগবান্ বিশ্বেশ্বর আমাকে এমন অবসর জুটাইয়া দিয়াছেন, যে বলিবামাত্রই আমার সে কথা

রক্ষিত হইতে চলিয়াছে। তাই বলিতেছি, "জগতে সময়ের দেখা অনুসারে স্ত্রীপুরুষ কেন সকলেরই প্রণয় অপ্রণয় হয় এবং ঘটনা পরম্পরায় যখন সেই প্রণয় গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া পড়ে, তখন তাহা ভঙ্গ করিতে গেলে সুফল বড় দেখা যায় না;— বরং প্রায়ই কুফল ফলিতে থাকে। আমার এই সুরেশ ও প্রভা বাল্যকাল হইতেই পরস্পরকে প্রণয়ের চক্ষে দেখিয়াছে; পরে ঘটনা পরম্পরায় সেই প্রণয় ক্রমশই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া পড়ায় উহাদের অভিপ্রায় ছিল যে, পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়। কিন্তু সমাজের চক্ষে সেটা ভাল দেখায় না বলিয়া কর্ত্তামহাশয় তাহাতে অমত প্রকাশ করেন। ইহার পরের যত কিছু ঘটনা আপনারা সকলেই অবগত আছেন এবং তাহার মূলীভূত কারণ যে কি তাহাও বুঝিতেছেন। উহাদের আত্মা যে কত প্রশস্ত, আর চরিত্র যে কত উন্নত, কত নির্ম্মল তাহা, যাহারা দু'দিন উহাদের সঙ্গে থাকে, তাহারাই বুঝিতে পারে। এই অবস্থায় যদি উহাদের মধ্যে এখন বিবাহসম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সংসারের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারিবে। আর না হইলে, আবার সেই সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীই হইয়া যাইবে। তাই কর্ত্তামহাশয়ের নিকট আমার একমাত্র শেষ প্রার্থনা এই যে, উচ্ছৃঙ্খল সমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া অবিলম্বে উহাদিগকে বিবাহসম্বন্ধে সম্বদ্ধ করুন।

মায়ের এই শেষ প্রার্থনা শুনিয়া সকলের চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, আর একদিকে আমি ও আর একদিকে প্রভা অধোবদনে বসিয়া তাঁহার অপরিসীম স্নেহের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

তখন শ্যামাচরণবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আপনার এ প্রার্থনা অতি সঙ্গত এবং ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। আর এ সম্বন্ধ সমাজের চক্ষেই বা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইবার কারণ কি? তাহাতে

প্রকৃতি চিরসুখী হইতে পারে এবং নিজ পরিজনেরও সুখশান্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহা সমাজের পক্ষেও হিতকর বলিয়া মনে করা উচিত।"

পরে মা আবার বাবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এখন বলুন, যে আমার এই শেষ প্রার্থনা পূরণ করিবেন।"

বাবা অবনতমস্তকে উত্তর করিলেন, "যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্যই করিব; কিন্তু আমারও যেরূপ শারীরিক অবস্থা, তাহাতে আমার কর্ত্তৃত্বে এ কাজ করিয়া যাইতে পারি কিনা সন্দেহ।"

শুনিয়া মা আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা সুরেশ, আমার আরও কাছে আসিয়া ব'স।" আমি নীরবে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলাম। পরে তিনি প্রভার হাত ধরিয়া আরও নিকটে আনিয়া বসাইলেন এবং নিজের বুকের উপরেই তাহার হাত আমার হাতের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, বাবা সুরেশ, আমার নিকট তুমিও যেমন স্নেহের পাত্র, প্রভাও তেমনই স্নেহের পাত্রী—তোমার কষ্ট দেখিলে আমার যেরূপ কষ্ট হয়, প্রভার কষ্ট দেখিলেও আমার ঠিক সেইরূপ কষ্ট হইয়া থাকে; তাই তোমাদের উভয়ের কষ্টে আমি এতদিন দ্বিগুণ কষ্ট পাইয়া আসিতেছি। সেই কষ্ট দূর করিবার জন্যই আমি প্রভাকে আজ তোমার হাতে প্রদান করিলাম। প্রচলিত রীতি অনুসারে তোমাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হউক, আর না-ই হউক, এই-ই তোমাদের প্রকৃতবিবাহ হইয়া গেল মনে করিও; আর আজ হইতেই প্রভাকে তুমি তোমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া জানিও এবং পূর্ব্বে তাহাকে যেরূপ প্রণয়ের চক্ষে দেখিতে, চিরদিন সেইরূপ প্রণয়ের চক্ষে দেখিয়া তুমি তাহার মঙ্গল [illegible] করিও। তাহাতে সমাজ যদি তোমাকে

নিন্দা করে, তবে এই মাতৃ-আজ্ঞা স্মরণ করিয়া তোমার কর্ত্তব্যপালনে একটুও বিচলিত হইও না।"

পরে প্রভার দিকে ফিরিয়া মা আবার বলিতে লাগিলেন, "প্রভা, মা আমার! এতদিনে তোর দুঃখ দূর করিতে পারিলাম! তুই সুরেশকে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছিলি — তুই-ই আবার তাঁহাকে গৃহী করিয়া নিস্! তোকে আর আমি কি উপদেশ দিব?— স্ত্রীলোকের কদাপি স্বামিবাক্য লঙ্ঘন করিতে নাই,—স্বামিসঙ্গও পরিত্যাগ করিতে নাই, ইহা বুঝিয়া কাজ করিস্; তাহা হইলে ইহকাল পরকালে তোর আর কোন দুঃখ থাকিবে না।" এই কথা বলিতে বলিতে মার চোক দিয়া দরদরধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। সেই করুণ দৃশ্য দেখিয়া কেহই আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না; উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে ইচ্ছা হইলেও আমরা সেরূপে কাঁদিতে পারিলাম না—কেবল অশ্রুধারায় আমার ও প্রভার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই মা বাবার পা ধরিয়া মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহাকে গঙ্গায় লিয়া যাইতে বলিলেন। নরেশের উদ্যোগে অবিলম্বে গঙ্গাযাত্রার যোগাড় হইল এবং যথাসময় তাঁহাকে গঙ্গায় নেওয়া হইল। পরে সন্ধ্যার সময় কাশীধামে, মণিকর্ণিকার ঘাটে, সজ্ঞানে বিশ্বেশ্বরের নাম করিতে করিতে মা দেহত্যাগ করিলেন।

তখন প্রভা কর্ণভেদী কাতরস্বরে, "মা, মা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমিও কিছুকাল অশ্রুপাত করিয়া পরে মাতৃশোকের পূর্ণ উচ্ছ্বাস নিবারিয়া আবার কর্ত্তব্য সব করিয়া যাইতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখাদির সময়, প্রভাকে যে মুখ দিয়া তাঁহার অনন্ত অসীম স্নেহধারা

নিঃসৃত হইত, পুত্র হইয়া আমি তাহাতেই আগুন দিতে যাইতেছি, মনে করিয়া এমন আর একটা উচ্ছ্বাস আসিয়া পড়িল যে, আমি মন্ত্রপাঠ করিতে যাইয়া "হাউ হাউ" করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তখন সকলে আসিয়া আমাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। শেষে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে যথাশক্তি মন্ত্রপাঠ করিয়া মুখাগ্নিকার্য্যাদি সমাপন করিলাম এবং মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল সুখ-শান্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া স্নানান্তে আমরা সকলে অত্যন্ত-শোকাকুল-হৃদয়ে বাসায় ফিরিলাম।

বাসায় ফিরিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, যেন এই সমস্ত সংসারটা একটা বিরাট শ্মশান এবং আমরাই যেন তার সৃষ্টিকর্ত্তা! মা সকলেরই আছে এবং মাতৃশোকও অনেকেই প্রাপ্ত হয়! কিন্তু এমন মা ক'জনের আছে? আর এমন শোকই বা ক'জনে পাইয়া থাকে? যতই তাঁহার কথা মনে পড়িতে লাগিল, ততই শোকাবেগ বাড়িতে লাগিল! তাঁহার অসীম স্নেহের ছায়ায় যে কত সুখশান্তি, কত আশাভরসা পাইয়াছি, পূর্ব্বে তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই; তখন যতই বুঝিতে লাগিলাম, ততই বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

প্রভার অবস্থা আমার চেয়েও বেশী শোচনীয় হইয়া পড়িল। সে বাল্যকালে মাতৃহীনা হইয়াও মা'র গুণে মাতৃশোক যে কি জিনিষ তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল না। মা'র অভাবে আজ তার সেই পূর্ব্বশোক পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং তাহার গভীর আর্ত্তনাদে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হইতে লাগিল।

তখন সকলে আসিয়া নানারূপ প্রবোধ দিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু সান্ত্বনাবাক্যে কি সে হৃদয়তাপ নিবারণ করিতে

পারে?—কেবল সংসারের অসারতা প্রমাণ করিয়া আনুষঙ্গিক ঔদাস্য বাড়ায় মাত্র। কখন এমন একটা বিরাগ আসিয়া পড়ে যে অন্তরাত্মা তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। আমাদেরও তাহাই হইল—বিরাগে বিলীন হইয়া কলায় সংসারটাকে একেবারেই যেন ভুলিয়া গেলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

অনাদি অনন্ত কাল সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাহার বিচিত্রপ্রভাব বিস্তার করিয়া এই জগৎটাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে; ভূত ও ভবিষ্যৎ আবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, নিজের মত করিয়া নিতেছে। আর জীবমাত্রেই আত্মরক্ষার স্বাভাবিক চেষ্টায় একবার অতীত, আবার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বর্ত্তমানে নিজের মত সামলাইয়া নিতেছে। তাই কালের প্রভাবে সুখ দুঃখ, শোক তাপ, সম্পদ বিপদ কিছুই চিরস্থায়ী হয় না—সকলই কালে বিলীন হইয়া যায়। আমাদেরও শোকাবেগ ক্রমশই কমিয়া আসিল এবং ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সব করিয়া যাইতে লাগিলাম। যথাকালেই মায়ের শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল; পরে আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত আমরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

নরেশ, লীলা, শ্যামচন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলেই আমাদিগকে বাড়ী নিয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু বাবা তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন "আমার এই শেষ জীবনে, দেশে যাইবার ইচ্ছা নাই,—আর যে কয়দিন আছি, বিশ্বেশ্বরের চরণপ্রান্তে এই কাশীধামেই থাকিতে চাই। তবে আপনাদিগকে আমি বাধা

দেই না—আপনারা দেশে যাইতে পারেন, সকলে মিলিয়া কাশীতে থাকিলে ঘর সংসার কিছুই রক্ষা পাইবে না।"

শ্যামাচরণবাবু তখন দেশে যাইবার দিকেই ঝুকিয়া পড়িলেন; কিন্তু নরেশ ও লীলা আমাদিগকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে চাহে না। শেষে ব্যাপারটা এমন অবস্থায় যাইয়া দাঁড়াইল যে, বাধ্য হইয়া শ্যামাচরণবাবুর অনুরোধে আমাকেই নরেশ ও লীলাকে বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে হইল।

তাহাতে নরেশ বলিল, "তোমার অনুরোধে বাধ্য হইতে পারি; যদি তুমি প্রতিশ্রুত হইতে পার যে, সময়ে তুমি প্রভাকে নিয়া দেশে যাইবে।"

অগত্যা আমি তাহাই স্বীকার করিলাম। তখন তাহাদের সকলেরই দেশে যাওয়া স্থির হইল। ঠিক হইল পরের দিনই রওনা হইবে।

সে দিন রওনা হইবার পূর্ব্বে সকলেই যাইয়া বাবার নিকট সমবেত হইল। পরে বাবা শ্যামাচরণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনারা আমার যে উপকার করিয়া গেলেন, কোন দিন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। প্রত্যুপকারে কিছু করিতে পারি এরূপ সম্ভাবনা না থাকিলেও, আমি অনুরোধ করিতেছি আপনাকে আর একটা উপকার করিতে হইবে। আমার অভাবে আপনিই সুরেশের পিতৃস্থানীয়— আপনাকেই তাহার হিতাহিত দেখিতে হইবে। আমার স্ত্রী যে ভাবে প্রভাকে সুরেশের হাতে দান করিয়া গিয়াছে, শাস্ত্রমতে অনেক প্রকার বিবাহের মধ্যে সেও এক প্রকার বিবাহ। যদি আমি আরও কিছুদিন জীবিত থাকি, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রীর অভিলাষ পূরণ করিয়া যাইতে পারিব; আর না হইলে

সেই সময়েই সুরেশ ও প্রভার বিবাহ হইয়া গিয়াছে জানিবেন এবং দেশে যাইয়া এই কথাই সমাজে প্রকাশ করিবেন।"

শুনিয়া শ্যামাচরণবাবু বলিলেন "আমি চিরদিন জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় আপনাকে ভয় ও ভক্তি করি এবং সে কেবল আপনারই গুণে। সুতরাং আপনার কাছে যাহা বলি, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা বলিয়া মনে করিবেন না। আমি সুরেশকে নরেশের চেয়ে একটুও কম স্নেহের চক্ষে দেখি না; সুরেশ ও প্রভার বিবাহ-সম্বন্ধে সমাজে যাইয়া ঐরূপ কথা প্রকাশ করিবার কল্পও আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তজ্জন্য আপনার আর কিছু বলিতে হইবে না; আপনি অনুগ্রহ করিয়া কখন কিরূপ থাকেন, জানাইলেই বাধিত হইব।"

খোকা এতক্ষণ নীরবে প্রভার কোলে বসিয়া স্নেহাধিকার বিস্তার করিতেছিল। বাবা তাহাকে ডাকিয়া নিজের কোলে নিয়া বসাইলেন এবং বাক্সের মধ্য হইতে তাঁহার পিতৃদত্ত বাল্যকালের এক ছড়া বহুমূল্য হার বাহির করিয়া খোকার গলায় পড়াইয়া দিয়া বলিলেন "দেখ সুরেশ, আমার পিতামাতার স্নেহের নিদর্শন—আমার পক্ষে অমূল্য, এই হার আমি এতদিন যে উদ্দেশ্যে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ না হওয়ার দুঃখ, আজ দূর করিলাম। তোমরা চিরদিন খোকাকে সন্তানের ন্যায় দেখিয়া আমার এই হারের মর্য্যাদা রক্ষা করিও—।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাঁহার সেই আবেগ দেখিয়া সকলেই বাড়ী যাওয়ার কথা ভুলিয়া গেল এবং নীরবনিস্পন্দভাবে সমবেদনা প্রকাশ করিতে

লাগিল। এমন কি খোকাও এমন মূল্যবান্ জিনিষ পাওয়ার আনন্দে গভীর দুঃখের ছায়া মিশ্রিত করিয়া ইতস্ততঃ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে বাবাই আবার বলিলেন "আপনারা আর অপেক্ষা করিবেন না; স্ত্রীলোক, ছেলে পিলে সঙ্গে নিয়া একটু পূর্ব্বে রওনা হওয়াই সঙ্গত।"

"আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে যে কি কষ্ট পাইতেছি, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি এরূপ শক্তি আমার নাই; তথাপি কর্ত্তব্যের খাতিরে নিতান্ত অসহ্য হইলেও, আমাদের সে কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে এবং আপনার ন্যায় পরম বন্ধুকে আজ এই অবস্থায় ফেলিয়া বাড়ী চলিয়াছি" সাশ্রুনয়নে এই কথা বলিতে বলিতে তারাচরণবাবু যাইয়া বাবাকে নমস্কার করিলেন।

তখন অন্যান্য সকলে বাবাকে নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান হইতেই প্রভা "আয়, খোকা আমার কোলে আয়" বলিয়া খোকাকে বাহুতে জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু খোকা "না, আমি যাইব না" বলিয়া বাবার কোলে ঘুরিয়া বসিল। সে যে কি করুণ দৃশ্য, তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। শেষে অনেক সাধাসাধি করিয়া প্রভা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং নানা প্রলোভনে তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। নরেশ ও লীলা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে "ভাই, মনে রাখিও" "আমরা কিন্তু তোমাদের কথায়ই তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম" এই কথা বলিতে বলিতে গাড়ীতে উঠিল। গাড়োয়ান সকল স্নেহের বন্ধন শিথিল করিয়া নির্দ্দয়ভাবে তৎক্ষণাৎ গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল।

আমরা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শূন্যঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

পরে অনন্যোপায় হইয়া প্রভাকে নিয়া আমিই সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলাম এবং বাবার যাহাতে কোনরূপে কোন কষ্ট না হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া, তিনি যখন যাহা বলেন, করিয়া যাইতে লাগিলাম। তখন আর অন্য চিন্তা মনে বড় স্থান পাইত না—সর্ব্বদাই ভাবিতাম "কবে আবার বাবা আমাদের মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।"

এই ভাবে দুই মাস কাটিয়া গেল। শেষে বাবার শরীরও আবার অসুস্থ হইয়া পড়িল। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সেই চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিলাম; কিন্তু বাবা ঔষধ ব্যবহার করিতে আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আমরা নিরুপায় হইয়া তাঁহার শারীরিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার জন্য মাঝে মাঝে সেই চিকিৎসককে ডাকিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে কেবল পথ্য-পাচন দিতে লাগিলাম। ক্রমশই তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িল—পথ্যপাচনে কোনই ফল হইল না। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই আবার তাঁহার জীবনেও আমরা হতাশ হইয়া পড়িলাম।

পূর্ব্বেই মাতৃশোকের আঘাতে আমাদের হৃদয় ভাঙিয়া গিয়াছিল; এবার ভাঙা হৃদয়ে পিতৃশোক পূর্ণাধিকার বিস্তার করিয়াও আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারিল না,—শোকাবেগ প্রবল হইয়া উঠিলেই যেন সেই ভাঙা দিয়া বহির্গত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের স্থান ছাড়িয়া দিত। তাই শোকাকুলপ্রাণেও আমাদের কর্ত্তব্যগুলি সব বুঝিয়া শুনিয়া করিয়া যাইতে লাগিলাম।

একদিন, আবার সেই বৈকাল বেলায়, বাবা আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা সুরেশ! আজ আমার শরীরটা যেন একটু অস্থির বোধ করিতেছি; হয় ত আমারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইতেছে। যদি আমার জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে তোমরা সাবধান হইয়া আমাকে গঙ্গাযাত্রা করাইও। তোমরা দু'জনেই ছেলে মানুষ—বিশেষতঃ শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িবে। সুতরাং সাবধান করিয়া দিতেছি "দেখিও যেন আমার সদ্গতি হয়।"

আমরা ইহার কি উত্তর করিব, কিছুই খুঁজিয়া না পাওয়ায় অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে তাঁহার দিকে চাহিয়া আমাদের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলাম। নিদারুণ মাতৃশোক আবার প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন বাবা আবার বলিতে লাগিলেন "দেখ, আমার কর্ত্তব্যবোধে আমি তোমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি এবং শেষে নিজেই তজ্জন্য নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। সে সব কথা তোমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইও এবং এখন যাহাতে সংসারী হইয়াই ধর্ম্মাচরণ করিতে পার তাহার চেষ্টা করিও। অন্যান্য বিষয়ে আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই;—তাহাতে তোমাদের মাতৃআজ্ঞাই আমারও আজ্ঞা বলিয়া মনে করিয়া সর্ব্বদা তাহা প্রতিপালন করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি "তোমাদের অবশিষ্ট জীবন সুখেই কাটিবে।"

বলিতে বলিতে তাঁহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া আসিল। তখন আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই দেখিয়া বুক ভাঙ্গিয়া আসিলেও

কাঁদিতে পারিলাম না—তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করাইলাম। ঠিক একই সময়ে একই ভাবে বিশ্বেশ্বরের নাম করিতে করিতে বাবারও দেহত্যাগ হইল।

তখন আমার আর কেউ নাই দেখিয়া পাষাণে বুক বাঁধিলাম এবং আমি নিজেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যোগাড় করিয়া, নিজেই আমার শেষ কর্ত্তব্য সব সমাধা করিলাম। পরে স্নান করিয়া উঠিয়া আমার প্রভাময় সংসার প্রকৃত শ্মশানেই পরিণত দেখিয়া, আবার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়িল—আবার সেই অকূলসাগর প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার সর্ব্বগ্রাসী ভীষণ তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে নিতান্ত অভিভূত হইয়া সেই শ্মশান ভূমিতেই বসিয়া পড়িলাম; আর সেই অকূলকাণ্ডারী শ্রীহরির কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। তখন মনে হইতে লাগিল, কে যেন প্রেমের অপূর্ব্ব বাঁশরী বাজাইয়া শূন্যমার্গে আবার গাহিতেছে—

ও গো! তোদের ভয় কিরে তায়!
(আমি) অকূলকাণ্ডারী হরি তুলে নিব; আয় ···

তখন ফিরিয়া চাহিতেই দেখি, সজলনয়নে নরেশ আবার আমার পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইয়াছে। দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম "এ কি! প্রত্যক্ষ? না মায়া? না দুই-ই? বংশীধারী প্রেমময় ভগবান্ এইভাবে জগন্ময়ী মায়ার বিস্তার করিতেছেন। আর আমরা সব তাঁহার সেই প্রেমবংশীর অমৃতময় তানে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরের হৃদয়ে সেই ভগবৎপ্রেমের উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করিতেছি! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান!

তাই প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মায়ায় ভুলিয়া রই এবং সেই অসীম প্রেমতৃষ্ণা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনুষ্যহৃদয়ে পরিতৃপ্ত করিতে যাইয়া আজীবন অতৃপ্তি অনুভব করি! ভগবান্ এই ভাবেই আমাদের নিয়া খেলা করিয়া থাকেন!"

—ভাবিতে ভাবিতে আমার এমনই একটা বৈরাগ্য আসিয়া পড়িল যে তাহাতে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া জীবের শেষ আশ্রয়স্থল ধরিত্রীর ক্রোড়ে পতনোন্মুখ হইতেই নরেশ ও প্রভা দু'জনে দুই দিক হইতে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল এবং আবেগভরে নরেশ বলিতে লাগিল "সুরেশ! ভাই! তোমায় আমরা আর কি প্রবোধ দিব? তবে এইমাত্র বলিতে পারি "তুমি এ ভাব পরিত্যাগ করিয়া এখন ঘরে চল; তুমি না ফিরিলে আমরাও আর ফিরিব না—তোমার সঙ্গে এই খানেই শ্মশানবাসী হইব।"

শুনিয়া আমি একটু গভীর বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলাম "ভগবান্ এই ভাবেই লোককে সংসারে বাঁধিয়া রাখেন! চল তাঁহার অভিপ্রায়ই পূর্ণ হউক" বলিয়া তখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং সকলে মিলিয়া আবার বাসার দিকে ফিরিয়া চলিলাম।

সেই অবধি নরেশ ও লীলা আমাকে যে ভাবে পরিচালিত করিতে লাগিল, জড়যন্ত্রের ন্যায় আমিও ঠিক সেই ভাবেই পরিচালিত হইতে লাগিলাম। দ্বিতীয় দিন বন্দোবস্ত সব ঠিক ঠাক করিয়া, তৃতীয় দিন প্রাতে তাহারা আমাকে নিয়া দেশের দিকে রওনা হইল। চতুর্থ দিন আমরা সকলে যাইয়া বাড়ী পৌঁছিলাম।

তখন সজলনয়নে রাধা আসিয়া উলুধ্বনি করিয়া আমাদিগকে

ঘরে নিয়া গেল। সেই উলুধ্বনি শুনিয়া প্রতিবেশিনীরা সকলে উপস্থিত হইয়া একে একে আমাদের সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমার ঔদাসীন্য তখনকার সেই সাংসারিকভাবে বিলীন হইয়া আমাকে পল্লীসমাজের কথা স্মরণ করাইয়া দিল এবং ইহাও বুঝাইয়া দিল যে, থাকিতে হইলে আমাকেও তাহা-দেরই এক জন হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং যথানিয়মে তাহা-দের প্রশ্নের উত্তর করিয়া যাইতে লাগিলাম। বাবামার মৃত্যু-সংবাদে তাহারা সকলে যেন শোকার্ত্ত হইয়াই অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্যবহারিক শোকের উচ্ছ্বাস আর কত-ক্ষণ থাকিতে পারে? কৌতূহল আর কোন রকমে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া অনতিবিলম্বেই এক জন বর্ষীয়সী উপহাস করিলেন "আরে তোদের নাকি বিবাহ হইয়া গিয়াছে।—অথচ তোরা ত সেই ভাই বোনের মতনই আছিস, দেখি।"

আমি ভদ্রতার খাতিরে তাঁহার সাধটা একটু না মিটাইয়া পারিলাম না। তাই উত্তর করিলাম "তাতে আর দোষ কি? ব্রাহ্মদের কথা শুনেন নাই? তাহারা ত মডেল ভগিনী ছাড়া বিবাহই করে না;—আর হিন্দুসমাজেও পিতামাতার অভাবে সকলকেই ভাই বোন সাজিতে হয়?"

তিনি আরও একটু চড়াইয়া শ্লেষ করিলেন "তবে শুধু ভাই বোন সাজা কেন? পিতামাতার অভাবে ব্রাহ্মমতে স্বয়ম্বরটা হইলেই বা দোষ কি? বিশেষ মডেল ভগিনীর মডেল ভ্রাতাই যখন এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

একটা অত্যুক্তি—বিশেষ আমাদের সেই অবস্থায়, রাধা সহ্য

করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল "আচ্ছা! স্বয়ম্বরটর পরে হইবে! আগে আপনার এই আড়ম্বরটা ছাড়িয়া দিন।"

কিন্তু তিনি স্ত্রীলোক হইলেও এত ভীরু নন যে, রাধার এক কথায়ই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবেন। তাহার উপরেও আর এক কাঠী চড়াইয়া বলিলেন "আরে তুই আবার কোন পয়গম্বর আসিলি, যে তোর আদেশ আবার মানিয়া চলিতে হইবে? তুই যা! তোর কেরামত একটু পরে জাহির করিস্।"

রাধাও চটিলে কম নয়। সে সেইভাবেই উত্তর করিল "আপনার পয়গম্বর স্বয়ং দিগম্বরের আদেশই মানিয়া চলেন বিস্তর! তার আবার আমার আদেশ—! তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া যেখানে একটুও কেরামত জাহির করিতে পারেন নাই, সেখানে আমাদের কেরামত জাহির করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা!"

রাধার এই ব্যঙ্গ শুনিয়া সকলেই হাসিয়া পড়িল; আর সেই বর্ষীয়সী দিগম্বরবাবুর স্ত্রী রাগে গড়্ গড়্ করিয়া বলিতে লাগিলেন "কোথাকার এক বাঁদী! তার কথা শুনিয়াছ? পায়ের যোগ্য মানুষ না তার গায় হাত দিয়া কথা। আমার বাড়ী এমন ঝি থাকিলে, এখনি তাহাকে ঝাটাইয়া বাহির করিয়া দিতাম।"

রাধা এবার চটিয়া লাল হইল। বলিল "শোন দাদাবাবু! মাগীর কথা শোন! ও যদি বামুন না হইয়া অন্য জাত হইত, তাহা হইলে ঝাটা মারিয়া কিরূপে বাহির করে, তাহা এখনই দেখাইয়া দিতাম।"

আমি বেগতিক দেখিয়া রাধাকে ধমক দিয়া বলিলাম "যা,

তুই এখন চুপ কর! আমাদের কোন সময়ে এখন তোরা কি ঝগড়া বাঝাইয়া দিলি!”

শুনিয়া অন্যান্য সকলেই বলিতে লাগিল “না! এ সব ভারি অন্যায়! ওরা পিতামাতার শোকে অবসন্ন; তাহাতে ওদের দু'টা প্রবোধ-বাক্য বলা ত দূরের কথা;—আসিতে না আসিতেই এরূপ ঝগড়া-ঝাটি বাঝান কি সঙ্গত?”

তখন “না! আমার আসাই অন্যায় হইয়াছে! আর ঝগড়া করিতে চাই না; আমি চলিলাম! এমন হতচ্ছাড়া বাঁদীর হাতে যে বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব সে বাড়ীতে আসিতে নাই” বলিয়া বক্ বক্ করিতে করিতে দিগম্বরবাবুর স্ত্রী বাহির হইয়া গেলেন।

এমন সময়ে নরেশ তাহাদের বাড়ীর সকলকে নিয়া উপস্থিত হইল; রামচরণও বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিল। তখন অন্যান্য সকলে তাহাদের ন্যায্যবাদিতা খ্যাপনের, কি আমাদের প্রতি আর একটু সহানুভূতি প্রকাশের অবসর না পাওয়ায় একে একে উঠিয়া চলিলেন, রাধা তাহার নির্দ্দোষিতা জ্ঞাপনের লোক না পাইয়া লীলা ও প্রভাকে নিয়া ভিতরে চলিয়া গেল; আর খোকা হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমার কোলে উঠিয়া বসিল।

আমাদের পরস্পরের বিলাপে প্রথমে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। পরে আমাদের হবিষ্য ও অন্যান্য সকলের আহারাদি হইয়া গেলে বৈকাল বেলা পুরোহিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে কি কি করা সঙ্গত, তাই নিয়াই আলোচনা আরম্ভ হইল।

অনেক মতামতের পর শেষে স্থির হইল যে যথাবিধি একোদ্দিষ্ট,

বৃষোৎসর্গ, ষোড়শ প্রভৃতি সমস্তই করা হইবে; কিন্তু আত্মীয়স্বজন এবং জ্ঞাতিবর্গমাত্র খাওয়ান হইবে। প্রজাসাধারণকে নিমন্ত্রণ করার আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহাতে শ্যামাচরণবাবু আপত্তি করিয়া বলিলেন "আমাদের যেমন সময়াভাব, তেমন অত্যন্ত লোকাভাব। এই অবস্থায় যাহার বন্দোবস্ত করা হইল, তাহাই সামলাইয়া উঠা দায়, প্রজাসাধারণকে বলিতে গেলে কিছুতেই কাজ কুলাইয়া উঠা যাইবে না। তোমার ইচ্ছা হইলে প্রজাদের জন্য আর এক দিন খাওয়াইতে পারিবে।"

যাহার উপর কাজকর্ম্মের সম্পূর্ণ ভার, তিনি একথা বলায় আমি আর প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। শেষে সেই. কল্পই স্থির করিয়া তদনুসারে যে যার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্যামাচরণবাবু নিজেই নরেশ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নিয়া সব যোগাযন্ত্র করিলেন। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন সমস্ত ঠিক ঠাক হইয়া গেলে নরেশ যাইয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল; তাহাতে সকলেই নিরাপত্তিতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল—কোনরূপ সামাজিক গোলমালের আর আশঙ্কা রহিল না।

পরের দিন সকালেই অশৌচপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল এবং নিমন্ত্রণানুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পাকশাক হইতে লাগিল। এদিকে যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও আরম্ভ হইয়া গেল। তাহার সব শেষ করিয়া উঠিতে বেলা প্রায় ১টা বাজিয়া গেল। তখন অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্তভাবে বেদী হইতে উঠিয়া দেখি একজন ব্রাহ্মণও উপস্থিত হয় নাই; তাহা দেখিয়া আমি একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। তাই শ্যামাচরণবাবুকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন পর্য্যন্ত যে একজনও ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইতেছে না, ইহার কারণ কি?"

শ্যামাচরণবাবু উত্তর করিলেন "ইহাতে আমিও একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। "চল ত, তুমি আমার সঙ্গে; 'ব্যাপারটা কি' একবার দেখিয়া আসি" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইতেই "আচ্ছা, চলুন" বলিয়া আমিও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম।

আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে তখন বৈকুণ্ঠবাবুই সমাজের নেতা। শ্যামাচরণবাবুর নিকট তাঁহার কথা শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম "তিনি একজন হোম্‌রা চোম্‌রা প্রকাণ্ড পদস্থ—অতি বিচক্ষণ লোক।" কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখি "খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশরঃ এক বিচিত্রদর্শন জীব পঞ্চতন্ত্রের সেই নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় পারিষদপরিবেষ্টিত হইয়া এক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন।"

শ্যামাচরণবাবুর সহিত অগত্যা আমিও যাইয়া তাঁহাকেই নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান হইতেই তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। সসম্ভ্রমে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া শ্যামা-চরণবাবুই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ সব এখনও যে বসিয়া আছেন? রান্নাবান্না সব হইয়া গিয়াছে,—বেলাও প্রায় ২টা বাজে; এখন চলুন, আপনারা আর অপেক্ষা করিবেন না।"

উল্লিখিত সেই বৈকুণ্ঠবাবু তখন গুরুগম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "আপনি এখন আর সে অনুরোধ করিবেন না;—আমাদের কাহারও এ নিমন্ত্রণে যাওয়া হইবে না।"

অমন সময় এমন সহজ, সরল টাট্‌কা জবাব শুনিয়া আমি একে-বারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। কিন্তু শ্যামাচরণবাবু সমাজেরই

লোক ! তিনি তাহাতে একটুও বিচলিত না হইয়া বলিয়া উঠিলেন । "সে কি ? বৈকুণ্ঠবাবু ! আপনাদের না নিয়া আমরা আজ ফিরিতেই পারি না । আপনার ন্যায় লোকের এখন সময়কালে অমন কথা মুখে আনিতে নাই ! আপনারা না গেলে সুরেশের যে সর্ব্বনাশ হইবে !"

উত্তরে বৈকুণ্ঠবাবু একটু বিরাগের হাসি হাসিয়া অনুযোগ দিলেন "তাহাতে আমাদের দোষ কি ? নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিলে অন্যে তার কি করিবে ?"

শ্যামাচরণবাবু উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন "কেন ? সুরেশ এমন কি অপরাধ করিয়াছে যাহার জন্য আপনি অমন কথা বলিতেছেন ? তাহার যদি কোন ত্রুটী হইয়া থাকে তাহা এখনই সংশোধন করিয়া নিন ।"

শুনিয়া বৈকুণ্ঠবাবুর প্রধান পারিষদ দিগম্বরবাবু হুঁঃশব্দে পূর্ব্বানুযোগ প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্যক্ত করিলেন "আপনি বলিলেন , আর তখনই আমরা সংশোধন করিয়া নিলাম । সামাজিক বিষয় এতই সহজ হইলে কোথাও কোন দিন গোলমাল হইত না !"

শ্যামাচরণবাবু ধীর স্থিরভাবে বুঝাইয়া বলিলেন "দেখুন, ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষার্থেই ত সমাজ ! সুতরাং অন্যায় কিছু করিতে যাওয়াটা সমাজের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত । বর্ত্তমান বিষয়ে যদি এমন কিছু জটিলতাই ছিল , তবে নিমন্ত্রণ গ্রহণের পূর্ব্বেই তাহা খুলিয়া বলা উচিত ছিল । নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া শেষে এভাবে বিপন্ন করিতে যাওয়াটা অন্যায় নয় কি ? বিবেচনা করিয়া দেখুন , দিগম্বরবাবু ! এই কি সামাজিক নিয়ম ?"

দিগম্বরবাবু উত্তর করিলেন "আপনার মতে আমরাই ত যেন সব অন্যায় , অসঙ্গত, অনিয়ম করিয়া আসিতেছি ! আচ্ছা ; জিজ্ঞাসা করি

আপনারাই বা কোন নিয়মটা রক্ষা করিয়াছেন?—নিমন্ত্রণটা পাঠাই-বার পূর্ব্বে আমাদিগকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?"

"প্রচলিত রীতি অনুসারে যাহাদের সহিত পূর্ব্ব হইতেই সামাজিকতা থাকে, তাহাদের ত আর নূতন করিয়া কিছু বলিতে হয় না,—কেবল পরামর্শের জন্য আত্মীয়স্বজন দুই এক জন ডাকা হয় মাত্র। সুরেশ ত তাহা করিয়াছে" বলিয়া শ্যামাচরণবাবু নীরব হইতেই "আমরা ত আর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে নয়; আমাদের দিয়া আর কি হইবে? কেবল খাওয়ার সময় ডাক দিলেই কুকুরের মত দৌড়িয়া যাইব,—না?" বলিয়া বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহার ক্ষুণ্ণাভিমান প্রকাশ করিলেন।

শুনিয়া শ্যামাচরণবাবু একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "আপনার এসব কথা ন্যায়সঙ্গত নয়; আপনাকে ডাকা হয় নাই কি?"

ন্যায় অন্যায় ত কেবল আপনার কাছে নয়,—আমাদের কাছেও আছে" এই কথা বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠবাবু যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

অবস্থাটা বড় ভাল দাঁড়াইতেছে না, দেখিয়া তখন আমি অতি বিনীতভাবে বলিলাম "আপনারা যদি না যান তাহা হইলে আমার পিতৃ-শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে! আপনাদের কাছে আমি নিতান্ত বালক— সামাজিক রীতিনীতিসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যদি সে বিষয় আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা আমি অবোধ বালক বলিয়া ক্ষমা করিয়া আমার পিতৃশ্রাদ্ধ যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তাহাই করুন।"

শুনিয়া বৈকুণ্ঠবাবু বলিলেন "তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, আর আমি ক্ষমা করিলাম, তাহাতে তোমার সকল দোষ ক্ষালন হইবার নয়;—

তোমার ঘরে খাওয়া সম্বন্ধে যে কেবল একটা মাত্র তাহা নয়, আরও অনেক আপত্তির বিষয় আছে।"

আমি অত্যন্ত নরম হইয়া বলিলাম "সে গুলি কি? তাহা না জানিলে কি করিয়া সংশোধন করি?"

আমার অনুনয়বিনয়ে বৈকুণ্ঠবাবু একটুও ভুলিলেন না,—সমাজের বিষদন্ত বাহির করিয়া ক্রমশই তাঁহাদের হিংস্রস্বভাবের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন "তা বলিলে তোমার নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া পড়িবে; আর তুমি তাহা সংশোধন করিতে পারিবে না।"

দায়ে পড়িয়া তথাপি আমি নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না। বলিলাম "আচ্ছা, অপ্রিয় হইলেও বলুন; তারপর দেখি, তাহা সংশোধন করিতে পারি কি না।"

তিনি এবার আর গোপন করিতে পারিলেন না; প্রকাশ্যেই বলিয়া উঠিলেন "আপত্তির বিষয়টা কি? তোমরা যেরূপ চরিত্রহীন, তাহাতে তোমার ঘরে খাওয়া দাওয়া চলিতে পারে না।"

'চরিত্রহীন' কথাটা ক্রূর সর্পের ন্যায় আমাকে এভাবে আসিয়া দংশন করিল যে তৎক্ষণাৎ আমার মাথার রক্ত উঠিয়া বসিল, জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে 'ঘা মুখে কি কোন ঔষধ প্রয়োগ করা যায়' তজ্জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 'কথাটা যেন ধারণাই করিতে পারিলাম না' এইরূপ ভাণ করিয়া আমি অতি বিনম্রভাবেই বলিলাম "যাহা বলিলেন, একটু বিবৃত করিয়া না বলিলে সংশোধন করা ত দূরের কথা, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

বৈকুণ্ঠবাবু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন "তাহার আর বিবৃত করিয়া কি বলিব? আজকালকার ব্যাপার সকলই ত অদ্ভুত! তোমরা ত

আর সমাজ সামাজিকতার ভয় কর না—যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিয়া থাক! ঐ যে ছেলেবেলা হইতে তুমি একটা দুশ্চরিত্রা মেয়েকে নিয়া আছ ওটাকে এখনও কোন সম্পর্কে রাখিয়াছ? ওটাকে এখনই তাড়াইয়া দিয়া যদি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সমাজে দশ টাকা জরিমানা দিতে পার, তাহা হইলে তোমার বাড়ী খাওয়া হইতে পারে, নতুবা কিছুতেই হইবে না!"

শুনিয়া ক্রোধে আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতে লাগিল তৎক্ষণাৎ এক থাবায় সে শৃগালের মুণ্ডপাত করি; কিন্তু পারিলাম না—লজ্জায় ঘৃণায় তাহার সহিত আর কথা বলিতেও ইচ্ছা হইল না।

এই অবস্থায় শ্যামাচরণবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "দেখুন বৈকুণ্ঠবাবু, আপনি আজ সমাজের নেতা হইয়া বসিয়াছেন বলিয়া মুখে যাহা আসে তাহাই বলিবার অধিকার আপনার নাই! আপনি কি জানেন না যে প্রভা সুরেশের পরিণীতা পত্নী? আমি কাশী হইতে ফিরিয়াই আপনাদের একথা জানাই নাই, যে জগদীশবাবুর স্ত্রীর জীবিত অবস্থায়ই উহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে? আমার জ্ঞান বিশ্বাসে যতদূর জানি তাহাতে একবাক্যে বলিতে পারি "সুরেশের ন্যায় ধার্ম্মিক চরিত্রবান্ ছেলে আর প্রভার ন্যায় সাধ্বী চরিত্রবতী মেয়ে আমাদের সমাজেই নাই। তাহাদের চরিত্রে এরূপ নিতান্ত গর্হিত মিথ্যাদোষারোপ করিয়া অন্যায় অসঙ্গতভাবে যদি পুণ্যাত্মা স্বর্গীয় জগদীশবাবুর শ্রাদ্ধে সকলের অন্নগ্রহণে বাধা দেন, তাহা হইলে জানিবেন, ধর্ম্ম কখনও এ অত্যাচার সহ্য করিবে না। যে লোক আজীবন সমাজের নেতা ছিলেন, আজ তাহারই শ্রাদ্ধ। সুতরাং বোঝা উচিত যে, এ নেতৃত্ব চিরদিন থাকিবে না।"

দিগম্বরবাবু এতক্ষণ বসিয়া যেন প্রতিহিংসাসুখ অনুভব করিতে-ছিলেন। এই সময় বিকট হাস্যের সহিত তিনি বিদ্রূপ করিলেন "কেন, আপনিই সেটা কাড়িয়া নিবেন নাকি ?"

তাহার উত্তরে শ্যামাচরণবাবু বলিলেন, "দেখুন দিগম্বরবাবু আপনার ন্যায় দুর্জ্জনের সহিত বাদপ্রতিবাদ করিতে আমি ঘৃণা বোধ করি, যাহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও হীন স্বার্থের জন্য এইরূপ অধর্ম্মের কাজ করিতে পারে, তাহারাই আজ সমাজের নেতা! ইহা হইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় সমাজের পক্ষে আর কি হইতে পারে ?"

"আর সৌভাগ্যের বিষয় আপনার! হার একছড়া পাইয়াছেন, আরও কত উপহার পাইতেছেন ! তাই চোরের সাক্ষী গাঁইটকাটা সাজিয়া আসিয়াছেন—না ? আপনার আর ধর্ম্মোপদেশ দিতে হইবে না; আমরা সুরেশের ঘরে জলগ্রহণও করিব না" বলিয়া বৈকুণ্ঠ বাবু দিগম্বর বাবুর দিকে ফিরিয়া অভিমানের কদর্য্যবিকারে এমন এক বিকটভঙ্গী করিলেন যে, তাহা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাই অন্যান্য যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদেরও কি এই কল্পই স্থির ?"

কি কারণে জানি না, তাঁহারা কোন উত্তর করিলেন না; বৈকুণ্ঠবাবুই আবার বলিলেন, "উহারা সমাজের লোক নন ?—উহারা কি আর অন্যমত করিবেন ?"

তখন আমি লজ্জায়, ঘৃণায়, রোষে, ক্ষোভে নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলাম, "আপনারা সকলেই শুনিয়া রাখুন,— হইতে পারে আপনাদের কাছে, প্রভা দুশ্চরিত্রা, কারণ কৌলীন্যের গুণে

আপনাদের পরিবারের মধ্যেও সচ্চরিত্রা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু কেবল আমার কাছে কেন , যে তাহাকে জানে তাহার কাছেই সে দেবচরিত্রা ; সুতরাং আপনাদের এই নিতান্ত জঘণ্য ক্রূর সমাজকে তুচ্ছ তৃণের ন্যায় অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারি , তথাপি তাহার ন্যায় দেবীকে বিসর্জ্জন দিতে পারি না। আর একথাও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আপনাদের ন্যায় ব্যাধবৃত্তি ব্রাহ্মণকে না খাওয়াইয়া চণ্ডালদের খাওয়াইলেও ফল অনেক বেশী হইবে ! ”

পরে শ্যামাচরণবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিলাম , “চলুন কাকাবাবু ! আমার আর ব্রাহ্মণভোজনের দরকার নাই— আমি ধর্ম্মপ্রাণ চণ্ডালদের পায়ে ধরিয়া খাওয়াইব , তথাপি এই ব্রহ্মচণ্ডালদের নিকট আর এক কথাও বলিতে পারিব না।” এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিতেই শ্যামাচরণবাবুও গাত্রোত্থান করিলেন।

তখন দিগম্বরবাবু বৈকুণ্ঠবাবুকে লক্ষ্য করিয়া “শুনুন ওর কথাবার্ত্তা, শুনুন ” এই কথা বলিতেই তিনি শাসাইতে লাগিলেন , “ওদের বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছে ! আচ্ছা , দেখা যাইবে কত বড় আস্পর্দ্ধা !”

শুনিয়া আমি আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলাম , “আপনাদের ন্যায় ক্ষুদ্র কীটের উপরই আপনাদের সমাজ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে ; কিন্তু যাহাদের মনুষ্যত্ব আছে তাহারা এ সংসারকেই অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে—এ সমাজ তাহাদের কি করিতে পারে ? ”

এই বলিয়া আমরা বেগে বাহির হইয়া পড়িলাম , — তাহাদের কোন কথায় আর কর্ণপাত করিলাম না। মনে এতই দুঃখ হইল যে পথে পথে আমরা আর কোন কথাই বলিতে পারিলাম না ,— কেবল

সমাজের এই অতিনিষ্ঠুর খলপ্রকৃতির কথাই ভাবিতে লাগিলাম, আর মনে মনে আক্ষেপ করিলাম, "হায়! কতদিনে সমাজের চক্ষু ফুটিবে —কতদিনে উহার পুনঃসংস্কার হইবে!"

বাড়ী ফিরিয়া দেখি, "আমাদের কয়েকজন মাতব্বর প্রজা প্রচুর পরিমাণে মাছ, তরকারি, দুধ, কলার পাতা ইত্যাদি নিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা আমাকে দেখিয়াই অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপব্যঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিল, "আমাদের কর্ত্তাবাবু ও গিন্নীমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া আমরা যে কত দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কি করিয়া কব! খোকা বাবু! তুমি বাড়ী আসিয়াছ শুনিয়াও তোমার এই দুঃখের সময় সাহস করিয়া দেখা করিতে পারি নাই। আজ তাঁহার শ্রাদ্ধের কথা পরস্পর শুনিতে পাইয়া একবার ভাবিলাম, "খোকাবাবু কি আমাদের না ডাকিয়া শ্রাদ্ধ করিবে?" আবার মনে হইল "তা করিতেও পারে! সেত ছেলেমানুষ—তাহাতে বহুদিন সংসারত্যাগী — সে কি করিয়া জানিবে কি করিতে হয় . না হয়। তাই বোধ হয়, আমাদের আর ডাকা হয় নাই। তবু আমাদের কর্ত্তব্য ত আমাদের করা উচিত বলিয়া কিছু মাচ টাচ নিয়া আসিয়াছি। কিছু পূর্ব্বে সংবাদ দিলে তোমার আর মাচ, তরকারি, দুধ কিছুই কিনিতে হইত না — আমরাই সব যোগাড় করিয়া আনিতাম।"

সরলপ্রকৃতি প্রজাদের বিমল অন্তরের সেই সুকোমল ভাব দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, "এইত বর্ত্তমান্ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের পার্থক্য! প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্ব কি সমপ্রাণতা, যদি কিছু থাকে, ত উহাদের মধ্যেই আছে; এই জন্যই কি লোকে উহাদিগকে অশিক্ষিত ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করে?"

সাদরে তাহাদিগকে বসিতে দিয়া বলিলাম, "দেখ এখন তোমরা আসিয়া আমাকে যে কত সন্তুষ্ট করিয়াছ, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি এমন শক্তি আমার নাই! তোমরা বস্তুতই আপনার জন—প্রকৃত অসময়ের বন্ধু! তোমরা সত্যই অনুমান করিয়াছ, আমি নিতান্তই ছেলেমানুষ—নিতান্ত অনভিজ্ঞ! তাই তোমাদের ন্যায় আপনার জনকে পরিত্যাগ করিয়া চিরপরকে আপন করিতে গিয়াছিলাম। তাহার উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া এখন বেশ বুঝিয়াছি যে, সকলের আগে তোমাদের কাছে যাওয়াই আমার একান্ত উচিত ছিল; আর সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে তোমাদের এই অবোধ ছেলের অপরাধ ক্ষমা করিয়া এখনি যাইয়া আত্মীয়স্বজন সমেত আমার সকল প্রজাকে ডাকিয়া আনিবে। তোমাদের না খাওয়াইয়া আমি আর জলগ্রহণ করিব না।

আমার কথা শুনিয়া তাহাদের চোকে জল আসিল। শেষে অতি কাতরকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "খোকা বাবু! তুমি ও কি কথা বলিতেছ? উহাতে আমাদের যে অকল্যাণ হয়; তুমি ক্ষমা চাহিবে কেন?—তুমি ক্ষমা করিবে; তুমি প্রার্থনা করিবে কেন?—তুমি আজ্ঞা করিবে। ছেলে মানুষ হইলেও তুমি আমাদের রাজা—তোমার আদেশে যে আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি। একটা ভুল করিয়াছ, তাহাতে কি হইয়াছে?—তখন না ডাকিয়া এখন ডাকিতেছ! কর্ত্তাবাবুর শ্রাদ্ধে তুমি খাইতে ডাকিবে তাহাতে অত করিয়া বল কেন; বাড়ীতেও তোমারটা খাই, এখানেও তোমারটাই খাব; তুমি ডাকিয়াছ শুনিলেই সকলে চলিয়া আসিবে।"

"তবে যাও; আর বিলম্ব করিও না। এখনি যাইয়া আমার সকল

প্রজা এবং তাহাদের সকল আত্মীয়স্বজনকে আমার হইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া আইস।" আমি এই কথা বলিতেই তাহারা সকলে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

বেলা ৫ টা বাজিতে বাজিতেই দেখি তাহারা প্রায় পাঁচ শত লোক নিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখিয়া আমার এমন আনন্দ—এমন কৃতজ্ঞতা বোধ হইল যে, ইচ্ছা হইতে লাগিল সকল ছাড়িয়া দিয়া কেবল তাহাদের নিয়াই থাকি। তখন মনে মনে আক্ষেপ করিলাম হায়! এমন প্রজাকেও জমিদার তালুকদার পীড়ন করে! তাহাদের কি প্রাণ নাই? তাহারা কি নিজচক্ষে ইহাদের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে না — নিজকর্ণে ইহাদের কথা শ্রবণ করে না? করিয়াও যদি ওরূপ পীড়ন করে তবে তাহারা মানুষ নয়—রাক্ষস বিশেষ!

প্রজারা সকলেই আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া দাড়াইল। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া সকলকেই একত্র খাইতে বসাইয়া দিলাম এবং পরিবেশনের সুবন্দোবস্ত করিয়া নিজেই দেখিয়া শুনিয়া যাহার যাহা লাগে বলিয়া দিতে লাগিলাম। আমার আগ্রহ দেখিয়া তাহারা কি দিয়া যে তাহাদের সৌজন্য জানাইবে তাহা আর খুজিয়া পাইল না। অনেকেই অনেক কথা বলিতে লাগিল; তাহার প্রত্যেক কথাই এত মধুর এত হৃদয়গ্রাহী যে তাহা শুনিলে মনে হয়, তাহাদের অন্তরেই দেবধর্ম আছে —তাহারাই প্রকৃত মানুষ

আহারান্তে তাহাদের সন্তোষ দেখিয়া আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমার মনে হইতে লাগিল যেন পিতৃদেব তাহাদের সন্তোষেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমার অন্তরে বসিয়া বলিতেছেন "তোমার কার্য্য সফল হইয়াছে; আমি আজ এত পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে সহস্র ব্রাহ্মণভোজনেও ততটা হইতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।"

আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার সেই অন্তরের কথার এক বর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয় এবং একটু ভাবিয়া দেখিলে, বোধ হয় সে কথা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; তথাপি জনসাধারণের এমনই কুসংস্কার যে, যে সকল দীন হীন কাঙ্গালী অনশনে কি অর্দ্ধাশনে থাকে এবং পেটের জ্বালায় চাট্টি ভুক্তাবশেষ অন্নের আশায় অনাহূতভাবে উপস্থিত হয়, হৃদয়হীনভাবে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া খলপ্রকৃতি ব্রাহ্মণসমাজকে আগ্রহ করিয়া খাওয়াইতে যায়। না হইলে সৎকার্য্যমাত্রই নাকি পণ্ড হয়। কপটতা যাহাদের গৌরব, যাচ্ঞা যাহাদের পৈতৃক বৃত্তি, অসন্তোষ যাহাদের নিত্যসহচর আর নিন্দা যাহাদের একমাত্র প্রতিদান, তাহাদিগকে খাওয়াইতেই হইবে—আর শুধুভাত পেটভরা পাইলে যাহারা দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে, তাহাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইতে হইবে! দেবতা কি পিতৃপুরুষ কি এই ব্যবস্থা চান? হায়! সমাজ! কতদিনে তোমার এ ভ্রান্তসংস্কার দূর হইবে—কত দিনে দেখিতে পাইব, তুমি সত্যগ্রহণ করিতে শিখিয়াছ!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—:•:—

কর্তব্যের বেলায় সমস্তই আছে, কিন্তু বক্তব্যের বেলায় "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।" পুনস্তদেব স্যাৎ যদি ধর্মে ন সি স্থিতং" এর বেশী মানুষের পক্ষে আর কিছুই নাই। বড় আশায় বুক বাঁধিয়া কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ কেহ যথাশক্তি চেষ্টা করিল, কিন্তু ফলের বেলায়—তাহার পক্ষে ঔদাস্য—আর তাহার কার্য্যের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা! উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে সে হয়ত, মনে করিতে পারে, তাহার সাধনপ্রণালীতে কোন ত্রুটি ছিল; তজ্জন্যই সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহাই কি সত্য? তাহা হইলে একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া একাধিক লোক যখন একই প্রণালীতে কার্য্য করে, তখন ফলের বেলায় কাহারও পৌষ মাস, আর কাহারও বা সর্ব্বনাশ হয় কেন? কাজেই উত্তরে প্রবোধ দিতে হয় কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে; মা ফলেষু কদাচন।—তুমি আমি কাজ করিতে পারি, কিন্তু ফলাফল ঈশ্বরের ইচ্ছা।

আমাকে সংসারী সাজাইবার জন্য এতদিন প্রভা কত না কৌশল অবলম্বন করিয়াছে;—বাবার মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া আমার অজ্ঞাতসারে সে-ই নরেশের নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে নরেশের সহিত পরামর্শ করিয়া সে-ই আমাকে নিয়া

দেশে আসিয়াছে ও শ্রাদ্ধের পরে বড় আশায় বুক বাঁধিয়া সেই আত্মীয়স্বজন ও খোকাকে নিয়া সংসার পাতাইয়া দিয়াছে, কিন্তু কাজের বেলায় দেখি—

একদিন প্রভা অত্যন্ত ম্রিয়মানা অবস্থায় অধোবদনে বসিয়া আছে;— সে যেন কিছুই দেখিয়াও দেখিতেছে না, শুনিয়াও শুনিতেছে না,— তাহার অস্তিত্ব যেন থাকিয়াও নাই।

আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু সে আর মস্তক উত্তোলন করিল না। শেষে নিকটবর্ত্তী হইয়া হাত ধরিতেই দীর্ঘনিশ্বাসে রুদ্ধ শ্বাস ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া তাহার বেদনারাশি উন্মুক্ত হইল, তাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাহার দিকে চাহিতেই, সেও আমার দিকে চাহিল দেখিলাম, নয়নজলে তাহার অন্তর গলিয়া গিয়াছে, আর তাহার স্নিগ্ধ বিমল প্রতিবিম্ব আমার অন্তরেও আসিয়া বিম্বিত হইয়াছে। তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না; তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম 'প্রভা! তুমি এরূপ কেন? তোমার কি হইয়াছে?

বড় আক্ষেপে সে উত্তর করিল "আমার সোণার সংসার পুড়িয়া ছাই হইয়াছে।

"তাহাতে আর দুঃখ কি? তুমি যে পুড়িয়া সোণা হইয়াছ" আমি এইকথা বলিতেই সে জবাব দিল "তবে আর এখানে কেন? চল আবার পাহাড়ে যাই।"

আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন? দেশে কি কোথাও পাহাড় নাই?"

সে উত্তর করিল "হাঁ—আছে; কিন্তু সেখানে কেবল দুঃখ

অসুর বাস। তাহারা জ্যান্ত মানুষ চিবাইয়া খায়—তাহাদিগকে দেখিলেই আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "হউক না—তাহাতে তুমি এত ভীত হইলে কেন?"

আমার যে সব খাইয়া ফেলিয়াছে! শুধু তোমার চরণে দিয়াছি বলিয়া এখন প্রাণটা নিয়াই পলাইতে চাই। তুমি আর আমায় বাধা দিওনা—আমাকে নিয়া আজই কাশীতে চল; না হইলে এ প্রাণ কিছুতেই থাকিবে না "বলিয়া প্রভা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি প্রবোধ দিলাম " তুমি ত বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসিনী সাজিয়া যথেষ্ট ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেছ, আজ এত অধীর হইয়া পড়িলে কেন?"

সে উত্তর করিল, "তুমি যাহাই বল না কেন? আমি আর সহ্য করিতে পারি না। মুখে মুখে লোকে যেরূপ বিষ বর্ষণ করিতেছে, তাহাতে আমি একেবারে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছি; এখানে থাকিলে আমার জীবন কিছুতেই থাকিবে না। আমি তীর্থে তীর্থে পাহাড়ে পাহাড়ে তোমার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইব, তথাপি এ পাপ সংসারে থাকিয়া স্বকর্ণে মিথ্যাপবাদ শুনিতে পারিব না।"

তাহার আক্ষেপ দেখিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। বলিলাম "[illegible] কথাই তোমার চেয়ে আমার কানে বেশী বাজিতেছে! তাই এ সব পরিত্যাগ করিয়া আবার কাশীতে যাইয়া থাকিবার সঙ্কল্প, আমি পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু পাছে তোমার প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাও, এই ভয়ে আর তাহা প্রকাশ করি নাই। আজ যখন সে কথা তোমাকে নিজের কাণেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তুমি নিজেই

দেশত্যাগ করিতে চাহিতেছ, তখন আর এখানে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। এ পাপ সমাজ হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল মনে করি।"

প্রভা আর কোন কথা বলিতে পারিল না; বসিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। এমন সময় নরেশ খোকাকে নিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রভার অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল "একি! প্রভা, তুমি কাঁদিতেছ? আমি ত খোকাকে নিয়াই আসিয়াছি; এখন নাও. তোমার ছেলে তুমি নিয়া সুস্থ হও, আর উহাকেও শান্ত কর। ও তোমার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া, আকুল হইয়া পড়িয়াছিল।"

তপ্ত অশ্রু উজ্জল করিয়া খোকার গণ্ডস্থল আরক্ত হইয়া উঠিল; সে মুখে কোন কথাই বলিল না—প্রভার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্যের সহিত অগ্রসর হইতেই প্রভা তাহাকে কোলে তুলিয়া নিয়া আরও বেগে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

দেখিয়া আমার এমন দুঃখবোধ হইল যে, আমি বলিয়া ফেলিলাম, "হায়! এমন কোমল প্রাণেও লোকে আঘাত দেয়!"

শুনিয়া নরেশ বলিল "ভাই! আমাকে এবার ক্ষমা কর; আমি আর খোকাকে নিতে আসিব না। জানি না, কি কারণে বাবা মা আবার কাশীবাসী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; তাই তাঁহারা দেখিতে চান বলিয়াই খোকাকে নিয়া গিয়াছিলাম; না হইলে লীলা কি আমি উহাকে প্রভার কোলে দিয়াই শান্তি পাই।"

"দেখ ভাই! এ মায়ার সংসারে কোথাও শান্তি নাই; চল তোমার বাবা ও মাকে আজ আমাদের এখানে নিয়া আসি" বলিয়া আমি নরেশকে নিয়া বাহির হইলাম। পথে নরেশের নিকট কোন

কথাই প্রকাশ করিলাম না। তাহাদের বাড়ী যাইয়া বিশেষ আগ্রহ করিয়া শ্যামাচরণবাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে নিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

রাত্রে শ্যামাচরণবাবুর নিকট আমাদের দুঃখের কাহিনী সকল খুলিয়া বলিয়া আমাদেরও কাশীধামে যাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলাম।

শুনিয়া কিছুকাল তিনি চুপ করিয়া রহিলেন; পরে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন "যে ক্ষেত্রে তোমরা যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাতে বলিবার কিছুই নাই: তবে তোমাদের এই নবীন বয়সে ঘরসংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইলে, সেটা বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইয়া পড়িবে। লোকের কথার কি কোন মূল্য আছে? আজ যাহারা তোমাদের নামে মিথ্যাপবাদ রটাইতেছে, কাল তাহারাই আবার শতমুখে তোমাদের সুখ্যাতি করিতে পারেন। সুতরাং উহাতে বিচলিত না হইয়া ধীরভাবে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হয়, ফলে নিন্দাই আবার প্রশংসায় পরিণত হইয়া পড়ে।"

আমি প্রতিবাদ করিলাম "আপনিই এখন আমাদের পিতৃস্থানীয় আপনার আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে কতকটা শান্তির বিষয় ছিল। তাহা যখন হইল না তখন আপনার সঙ্গেই কাশীবাসী হইতে চাই! পিতা মাতার সেবাশুশ্রূষা অদৃষ্টে ছিল না; এখন আপনাদের সেবাশুশ্রূষা করিতে পারিলে, সে দুঃখ কতকটা দূর করিতে পারিব। তাই আপনি আর আমাদিগকে বাধা দিবেন না।"

শুনিয়া শ্যামাচরণবাবুর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল! তিনি আর আপত্তি না করিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন! শেষে সেই কল্পই স্থির করিয়া দু'দিন পরে আমরা যাত্রার দিন স্থির করিলাম।

পরের দিন প্রাতে শ্যামাচরণবাবু আমাদের নিয়াই বাড়ী চলিলেন। বাড়ী পৌঁছিয়া নরেশ ও লীলাকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি পরশু

তারিখ কাশীধামে রওনা হইব। আর এখন সুরেশ ও প্রভা আমার সঙ্গে যাইবে। আমি বেশ বুঝিতেছি, তাহাতে তোমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইবে; কিন্তু তাহা সারিবার উপায় নাই। কেবল তোমাদের নিয়া যদি আমি চলিয়া যাই তাহা হইলে, সুরেশ ও প্রভা কিছুতেই দেশে থাকিতে পারিবে না;—ফলে দু'টা সংসারই সম্পূর্ণ মাটী হইয়া যাইবে। আর আমাদের বৃদ্ধাবস্থায় কেবল আমরা দু'জনেও যাইয়া কাশীতে থাকিতে পারিব না। কাজেই সুরেশ ও প্রভাকে নিয়া যাওয়াই স্থির করিয়াছি। তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাড়ীতে থাকিয়া তোমাদের দুই দিক রক্ষা করিতে হইবে। সুরেশ ও প্রভা যেমন তোমাদের স্থলপাতী হইয়া যাইতেছে, তোমরাও তেমন তাহাদের স্থলপাতী হইয়া তাহাদের ঘরসংসার রক্ষা করিও।"

শুনিয়া নরেশ ও লীলার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; যতই দুর্ব্বহ হউক, কর্ত্তব্যভার একবার চাপিলে মানুষ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না!—দুঃখ দৈন্য, শোক তাপ সকল চাপিয়া রাখিয়া—সকলের উপরে সেই কর্ত্তব্যভার নীরবে বহন করিয়া থাকে। নরেশ ও লীলা তাহাই করিল। নীরবে কিছুক্ষণ দাড়াইয়া থাকিয়া লীলা প্রভাকে লইয়া চলিয়া গেল; নরেশ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "ভাই! তোমরা উত্তীর্ণ হইয়াছ; এবার আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইল; আশীর্ব্বাদ কর, যেন উত্তীর্ণ হইতে পারি।"

শুনিয়া যেমন দুঃখিত হইলাম, তেমন নরেশের মুখ দিয়া যে অত বড় কথাটা বাহির হইতে পারিয়াছে, এজন্য বেশ একটু সুখও অনুভব করিলাম। ফলে সুখদুঃখের অপূর্ব মিলনে তাহার সহিত মিলিত হইয়া সারাটা দিন যে কি ভাবে কাটাইয়া দিলাম, তাহা মুখে ব্যক্ত করিতে পারি আমার এমন শক্তি নাই।

"জগতে সুখও সুখদায়ক নয়, দুঃখও সুখদায়ক নয়—প্রকৃত সুখ-দায়ক সুখদুঃখের সুমধুর মিলনচিত্র! যাহার দিব্যভাবে প্রভাবিত হইয়া এ মর জগতে মানুষ অমর হইয়া রয়,—যাহার সুন্দর দৃশ্য স্মৃতি-পটে অঙ্কিত হইয়া আজীবন আনন্দবর্দ্ধন করে;—যাহার মাধুর্য্যই হৃদয়ের মাধুর্য্য, যাহার গৌরবই আত্মার গৌরব. আর যাহার অনুভূতিই আত্ম ধর্ম্ম অথবা প্রেম।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শেষ বেলা নরেশকে নিয়া তাহার ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইতেই দেখি, "লীলা প্রভাকে আয়না চিরুণী নিয়া সাজা-ইতে বসিয়াছে; আর খোকা একখানা সুন্দর নূতন কাপড় হাতে করিয়া যেন তাহার সাহায্যার্থ দাঁড়াইয়া আছে।" সেই এক দিন প্রভা তাহার সাধ মিটাইয়াছিল, আর আজ লীলা তাহার সাধ মিটাইতে বসিয়াছে দেখিয়া আমার বেশ একটু কৌতূহল উপস্থিত হইল; তাই নরেশকে নিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। লীলা অনন্যমনে তাহার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। নিজের ইচ্ছানুরূপ কেশবিন্যাস করিয়া সে তাহাকে শাখা সিন্দুর পরাইয়া দিল; পরে খোকার হাত হইতে কাপড়খানা নিয়া কাতরভাবে বলিল "দিদি! লক্ষ্মীটী আমার! এখন এই কাপড়খানা পর আমি একটা দিনের জন্য দেখিয়া পরিতৃপ্ত হই।"

নিরাপত্তিতে কাপড় খানা পরিয়া প্রভা লীলাকে জিজ্ঞাসা করিল বোন্! এবার তোমার আপত্তি মিটিল ত?"

"না দিদি! আরও একটু আছে" বলিয়া খোকাকে ধরিয়া প্রভার কোলে তুলিয়া দিয়া লীলা কহিল "এখন তোমার খোকাকে নিয়া দাদাবাবুর সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও; আমার আর কোন আপত্তি নাই—তবে এই বোন্‌টীর কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করিও" বলিতে বলিতে লীলা কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রভাও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। তথাপি ধীর, চিন্তাশীল-ভাবে উত্তর করিল "লীলা! আমাকে বড় বিপদে ফেলিলে বোন!"

"আমাকে কোন সম্পদে রাখিয়া গেলে? দিদি! তোমার সকল দুঃখ সকল দৈন্য আমার বুকে চাপাইয়া দিয়া আমার কি একটা দৈন্যও সারিবে না? দিদি!" বলিয়া লীলা অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

প্রভা বিপন্ন হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেই আমাকে লক্ষ্য করিল এবং করুণস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি কি বলিব" তুমিই বলিয়া দাও। এ অমূল্যধনের জন্য লোকে কত আরাধনা করে, আর আমি হতভাগিনী হাতে পাইয়াও বুকে ধরিতে পারি না" বলিয়া প্রভা ও কাঁদিয়া ফেলিল।

তখনকার সেই করুণ দৃশ্যে বিমুগ্ধ হইয়া কিছুকাল আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, পরে খোকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সে বলিয়া বসিল "না, আমি যাইবই" এবং 'আমরা নেই, কি না নেই' এই আশঙ্কায়ই তাহার মুখ ভারী হইয়া উঠিল।

দেখিয়া আমি আর বিবেচনা করিবার অবসর পাইলাম না—বলিলাম তবে উহাকে নিয়াই চল।"

তখন সন্ধ্যারও অবসান হইয়াছে; আর অপেক্ষা করিবার সময়ও নাই দেখিয়া "তবে এখন আসি, বোন!" বলিয়া লীলার নিকট বিদায় ভিক্ষা করিতেই সে প্রভার হাত ধরিয়া গলদশ্রুলোচনে অগ্রসর হইল। পরে শ্যাম চরণবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর নিকটে বলিয়া খোকাকে নিয়াই আমরা বাড়ী ফিরিলাম। এই সব ব্যাপার দেখিয়া নরেশ নীরব হইয়া রহিল— মুখ ফুটিয়া একটী কথাও বলিতে পারিল না।

বাড়ী ফিরিয়া দেখি. "রাধা নয়নজলে বয়ান ভাসাইতেছে।" দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর আবার কি হইল? রাধা!"

"আমার আবার কি হইবে? আমি পাগল হইয়াছি—আমার বড় সুখের ঘর নিজ হাতে ভাঙ্গিয়া, আজ আমার চিরআরাধনার ধন হারাইতে বসিয়াছি।" বলিয়া রাধা অজস্র ভাবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

তাহার ভাবে আমাদেরও অশ্রুপাত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম "অত কাঁদিস্ কেন? তুই কি চাস্'তা বল্ না?"

"আমি কি চাই?—আমি মরিতে চাই! তোমরা আমার এই জিভ্ কাটিয়া ফেল, যেন আর কোন দিন কাহাকেও কুবাক্য বলিতে না পারি—যেন আর বাচিয়া জগতের ভার না বাড়াই! "বলিয়া রাধা ঠিক পাগলের চরিত্রই অভিনয় করিতে আরম্ভ করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সে আবার কি? তোর মরিবার বা কি হইল? আর জিব কাটারই বা কি হইল?"

রাধা ঠিক সেই ভাবেই বলিতে লাগিল "আমার জিহ্বার দোষেই ত সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! আমার ন্যায় সর্ব্বনাশিনীর বাচার চেয়ে মরাই ভাল!" বলিতে বলিতে আবার সে 'হাউ, হাউ' করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শুনিয়া প্রভা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "ছি! অমন করিয়া কাঁদিতে নাই! তুই কি করিয়াছিস্? এই হতভাগিনীর অদৃষ্টদোষেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! এই হতভাগিনীর তুই যে উপকার করিয়াছিস্, তাহা জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না; —তোর সে ঋণ যে অপরিশোধনীয়!"

উত্তরে রাধা জিজ্ঞাসা করিল "প্রভা! দিদি আমার এখনও কি তুমি তাই মনে কর—এখনও কি এই পোড়ামুখীকে ভুলিতে পার নাই?"

"আমি কি আর তোর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি? পাগল!" বলিয়া প্রভা তাহাকে আশ্বস্ত করিল।

তখন রাধা আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "তোমার কি ধারণা? আমিই সর্ব্বনাশ করিয়াছি!—না? দাদাবাবু! বল,—আমার বুকের ভার কমাইয়া দাও।"

"তোরে কি আর আমি জানি না? রাধা! তুই যে আমাদের চিরহিতাকাঙ্ক্ষিনী—প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসিস্। তুই যখন যাহা হউক, আমাদের জন্যই করিয়াছিস্; বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাতে আক্ষেপের বিষয় থাকিলেও, তোর অপরাধের বিষয় কিছুই নাই।" আমি এই কথা বলিতেই "তবে আর আমি দুঃখ করি কেন?" বলিয়া রাধা একবার চোখের জল মুছিয়া তখনই আবার "আমাকে এই রাক্ষসীদের গ্রাসে ফেলিয়া যাইও না! দাদাবাবু!" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আচ্ছা, বেশ! তুইও আমাদের সঙ্গে যাস্;—তার কাঁদিস্ কেন?" বলিয়া আমি রাধাকে শান্ত করিতেই পিছন হইতে রামচরণ ধীর গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল "আর এই পুড়া থাক থাকবে একা রামচরণ! না? দাদাবাবু!"

আমি ফিরিয়া রামচরণের ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। পরে অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিলাম "দেখ, রামচরণ! তুমি আদেশ করিলে, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি এমন অধিকার আমার নাই! কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ বর্ত্তমান অবস্থায় আমি নিরুপায়

তাই অনুরোধ করিতেছি "যদি আমাকে একটুও ভালবাস তাহা হইলে নরেশের সহিত বাড়ীতে থাকিয়া আমার সকল ভার বহন কর; না হইলে নিশ্চয় জানিও এতদিন যে ঘরসংসার রক্ষা করিয়া আসিতেছ, তাহার আর কিছুই থাকিবে না।"

রামচরণ বিষম সমস্যায় পতিত হইল। শুধু আমাদের প্রতি নয়—জমিবাড়ী, ঘর দরজা, গরুবাছুর, এমন কি গাছপালার প্রতিও তার সমান মায়া—সেটা আবার আমাদের অসমক্ষে যেন একটু বাড়িয়া উঠে। তাই অনেকক্ষন ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল "এত অল্পবয়সে তুমি কাশীবাস করিবে, আর এই বুড়া রামচরণ তোমার সংসার নিয়া পড়িয়া থাকিবে এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। তথাপি তোমার অনুরোধ—আদেশ নয়, অনুরোধ—তা জীবন থাকিতে উপেক্ষা করিতে পারিব না! এই আমার কাশীধাম—আর তুমিই আমার বিশ্বেশ্বর;—তোমার আজ্ঞায় আমি থাকিলাম বলিয়া অন্তিমে একবার দেখা দিও" বলিয়া রামচরণও কাঁদিতে লাগিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কি বলিয়া যে তাহাকে প্রবোধ দিব, তাহা খুজিয়া পাইলাম না। ভাবিলাম "সংসারে আধিপত্য কাহারও কম নয়—দেবতারও নয়, দানবেরও নয়! মাঝ খানে পড়িয়া কেবল মানবের দুর্গতির একশেষ হয় মাত্র।" তাই সকল রকমেই ভগবানের আশ্রয় নিতে হয়, দেখিয়া সকল ভুলিয়া কাশীবাসী হওয়াই স্থির করিলাম এবং অনেক বলিয়া কহিয়া রামচরণকে শান্ত করিলাম।

শেষে সকলে মিলিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে রাত্রিটা প্রভাত হইয়া গেল। শ্যামাচরণবাবু তাহার স্ত্রী, লীলা ও

[illegible]রেশকে নিয়া এক গাড়ী করিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচরণ আমাদের জন্ত আর একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিল। তখন অনুরাগে বৈরাগ্য ও সংসারে সন্ন্যাস জড়াইয়া এই এক 'নূতনসন্ন্যাস' অবলম্বন করিয়া খোকা ও রাধাকে নিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন। [illegible] আমাদের অন্তরের কথা জানিয়াই গাড়ী [illegible] [illegible] পর বারংবার করিতে [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] [illegible] আর আমরা শুদ্ধদৃষ্টিতে [illegible] রহিলাম।

[illegible] ছাড়িবে বড় বিলম্ব নাই। [illegible] তাড়াতাড়ি টিকেট কাটিয়া [illegible] [illegible] আমাদের অন্তরের [illegible] [illegible] করিল অমনি ট্রেন ছুটিয়া চলিল আর [illegible] নয়নে নরেশ, লীলা ও রামচরণ চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির-দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সমাপ্ত।